প্র থ ম অ ধ্যা য়

উনিশ শতকের কলকাতার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট : শিষ্ট বা ভদ্র (লোক) ও অপর

উনিশ শতক বাঙালির জীবন-ইতিহাসে এক আলোকিত অধ্যায়। এক মাহেন্দ্রক্ষণ। এই সময়েই ঘটে অতীতের ঐতিহ্যের অন্ধ অনুসরণ থেকে মুক্তি আর রক্ষণশীলতা থেকে আধুনিকতায় উত্তরণ। নিস্তরঙ্গ বঙ্গজীবনে ওঠে নতুন প্রাণের হিল্লোল। আসে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছোঁয়ায় বাঙালি জীবনে যুগান্তর। ঘটে এতকালের প্রচলিত অর্থনীতির দিন বদল, অভিজাততন্ত্রের উদয়-অস্ত, নতুন যুগের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। সব মিলে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ভাঙাগড়ায় উদ্বেল। সেই ভাঙা-গড়ার পটভূমি হয়ে ওঠে সদ্যোজাত একটি নগর, কলকাতা। প্রথমে মূলত বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই এই নগরের সার্বিক বিস্তার ঘটে, পরে তা হয়ে ওঠে প্রশাসনের মূলকেন্দ্র। তাকে কেন্দ্র করেই এক ভিন্নমাত্রিক নাগরিক জীবনের সূচনা হয়। কালক্রমে ইংরেজ ঔপনিবেশিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিমণ্ডলে ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকা নতুন মহানগর কলকাতার পরিবর্তনশীল সমাজের নানা স্তরে নতুন নাগরিকতার বিকাশ লক্ষিত হয়। আর বাঙালি জীবনে নতুন নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণে কলকাতা নগরীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই নগর হিসেবে কলকাতার উত্থান প্রসঙ্গে দু চারটি কথা বলা প্রয়োজন। কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত সন্ধানকারী প্রখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ) যথার্থই বলেছেন :

> ‘বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে কলিকাতার প্রাধান্য ও গুরুত্ব কোনো সমাজবিজ্ঞানীই অস্বীকার করতে পারেন না। কলিকাতা মহানগরই বাংলার নতুন জীবনধারার প্রধান কেন্দ্র। তাই কলিকাতাই বাংলার নতুন ভাবধারা, নতুন মানস প্রকৃতি ও নবজাগৃতির উৎস।’[১]

এই তথ্য আজ আর কারো অজানা নয় যে সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা--- এই তিনটে গ্রামকে কেন্দ্র করেই কলকাতার মহা-নাগরিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। বিনয় ঘোষ আরও জানাচ্ছেন :

> ‘কোনও সমাজবিজ্ঞানীর বা নগরশিল্পীর সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে হয়ত ‘কলিকাতা’ আধুনিক মহানগরের রূপ পায়নি...তবু কলিকাতা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা মহানগর নয়।

> সেকালের সমাজব্যবস্থা, সেকালের জীবনধারা, সেকালের ভাবাদর্শ ভেঙে চুরে আত্মবিকাশের বেগে নতুন যুগের প্রচণ্ড তাগিদে জন্মলাভ করেছে কলিকাতা মহানগর। কলিকাতার বড় বড় রাজপথ আর অট্টালিকার তলায় শুধু সেকালের গোবিন্দপুর কলিকাতা আর সুতানুটি গ্রাম তিনটি সমাধিস্থ হয়ে নেই। অনেক গ্রাম, অনেক প্রাচীন নগর কঙ্কালে পরিণত করে কলিকাতা পুষ্টি লাভ করেছে। নতুন যুগের জয়যাত্রার পথে সেকালের গ্রাম্য সমাজ, সেকালের নগরশিল্প, সেকালের রীতিনীতি রুচি শিক্ষা সংস্কৃতি সব ভেঙে চুরে গড়ে উঠেছে কলিকাতা, আর তার সঙ্গে বিকাশ লাভ করেছে নতুন যুগের সমাজ, নতুন যুগের শ্রমশিল্প, নতুন যুগের জীবনধারা ও ভাবধারা, নতুন যুগের শিক্ষা সংস্কৃতি।'[২]

মহানগর আর তার বিকাশ সম্পর্কে বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী লুইস মামফোর্ড (১৮৯৫-১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ)এর মতামত হল :

> 'মহানগর হল মানুষের সচেতন মনের শিল্পরূপ এবং নগরের সর্বজনীন কাঠামোর মধ্যেই ব্যষ্টির স্বকীয়তা নিয়ে কলাশিল্পের বিকাশ হয়...ভাষার পরে মহানগরই হল মানুষের শ্রেষ্ঠ শিল্প কীর্তি।'[৩]

তবে একথা বললে ভুল হয় না যে ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে যেমন-ভাবে আগামীর মহীরুহের সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত থাকে, তেমনভাবেই একদিন গ্রাম কলকাতার মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল ভবিষ্যৎ মহানগরের স্বপ্ন। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে আগামীতে তা হয়ে উঠেছিল সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এই গ্রামগুলির নগরায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছিল ইংরেজ বণিকেরা। ইংরেজ বণিক জোব চার্নক (১৬৩০-১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতার জনক কিনা সে বিতর্কে প্রবেশ না করেও একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। তা হল ইংরেজ বণিকদের আগমনের পূর্বে কলকাতার অস্তিত্ব থাকলেও নগর হিসেবে তার ক্রমবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এই পরদেশি বণিকরাই। আর কলকাতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের সর্বাঙ্গীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট সুতানুটির বুকে চার্নকের পদার্পণের ঘটনার একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে। কলকাতা বিষয়ক গবেষক শ্রীপান্থের (১৯৩২-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ) কথায় :

> 'এই বিন্দু থেকেই ক্রমে সিন্ধু। ধীরে ধীরে মানচিত্রে রক্তবর্ণের ছটা---তিন গণ্ডগ্রাম মিলে বন্দর-নগরী কলকাতা।'[৪]

কাজেই উনিশ শতকের কলকাতার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আগে কলকাতার জন্মের ইতিহাসটা জানতে হবে।

প্র থ ম প রি চ্ছে দ

মহানগরের জন্মকথা : রূপ ও রূপান্তর

গবেষক নিখিল সুর জানাচ্ছেন ভারতের অন্যান্য নগর ও শহরের তুলনায় কলকাতা বয়সে নবীন। কিন্তু নানা বৈচিত্র্য আর বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এর আধুনিক নগরে রূপান্তরিত হওয়ার ইতিহাস অভিনব। H. Beverlyর 'Cencus of Calcutta in 1866' থেকে জানা যাচ্ছে :

> 'সম্ভবত বিশ্বের খুব কম সংখ্যক নগর কলকাতার মত এমন অতি সাধারণভাবে এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে কোনও সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ার গৌরব অর্জন করতে পেরেছিল।'[৫]

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইংরেজদের হাত ধরে কলকাতার আগামী দিনের যাবতীয় বাড়বাড়ন্ত সেই ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল অনেক পরে। পর্তুগিজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজ সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে বাণিজ্যের অধিকার লাভ। এই কাজে সবার আগে সফল হয়েছিল পর্তুগিজেরা। সেই ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে কালিকটে উপস্থিত হয়েছিলেন পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা (১৪৬০-১৫২৪ খ্রিস্টাব্দ)। তারপর থেকেই পর্তুগিজদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল কালিকটে তখন জামোরিন নামে একজন বেশ ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন, তাঁর আশ্রয়ে থেকেই পর্তুগিজদের এদেশে বাণিজ্যের সূত্রপাত। সেকালের কলকাতা সম্পর্কে চর্চা করতে গিয়ে সমালোচক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১২৬৮-১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) জানাচ্ছেন :

> 'পিড্রো এল্‌ভারেজ ক্যাব্রাল নামে একজন পর্তুগীজ ব্যবসায়ী ১৫০০ খ্রিঃ কালিকটে প্রথম ফ্যাক্টরি বা বাণিজ্য নিবাস স্থাপন করেন। ইহার পূর্বে পর্তুগীজেরা ভারতীয় বন্দরাদি হইতে মাল সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে চালান দিতেন। পর্তুগালের লিসবন নগরী সেই সময় ভারতীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের প্রধান ইউরোপীয় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।'[৬]

তারা শুধু যে বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তার করেছিল তাই নয়, তার সঙ্গে দুর্গ নির্মাণ, দাসব্যবসা, অত্যাচার সবই চলছিল পুরো-দমে। চট্টগ্রাম হয়ে উঠেছিল তাদের ভাষায় 'পোর্ট গ্র্যান্ডি' অর্থাৎ বড় স্বর্গ আর সপ্তগ্রাম হয়ে উঠেছিল 'পোর্ট পিকানো' অর্থাৎ ছোট স্বর্গ। তৎকালীন শাসক মোঘলদের দরবারেও তাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তারই ফলে অন্যান্য দেশের বণিকদের বাণিজ্যিক অধিকার লাভের পথে তারা বিভিন্ন বিঘ্ন সৃষ্টি করত।

এদিকে ব্রিটিশ বণিক-তন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সারা পৃথিবীতে ব্রিটিশ বণিকের অভিযান শুরু হয়। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে মুষ্টিমেয় ইংরেজ প্রাচ্য-দেশে বাণিজ্যের জন্য লন্ডনে একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। অলডারম্যান নামে একজন ইংরেজের গৃহে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। অলডারম্যানের সেই গৃহ 'Founder's Hall' নামে পরিচিত। সমালোচক জানাচ্ছেন :

> 'মূলধনের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াল তিরিশ হাজার একশ তেত্রিশ পাউন্ড পাঁচ শিলিং, আট পেনি।'[৭]

রানি এলিজাবেথের অনুমতি নিয়ে এই কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য করার সিদ্ধান্ত নেয়। যে চারটি জাহাজ ভারত অভিমুখে পাড়ি দেয় সেগুলি হল 'The Scourge', 'The Susan', 'The Hector', 'The Ascension'। অভিযানের নায়ক ছিলেন জন মেডেন হল। এর আগে র‍্যালফ ফিচ নামে একজন ইংরেজ পরিব্রাজক ভারতে ঘুরে গেলেও বাণিজ্যের জন্য ইংরেজদের এটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সম্রাট আকবরের সভায় পৌঁছন জন মেডেন হল। প্রচুর উপঢৌকনও দেন। কিন্তু ভাষা-জনিত ব্যবধান না ঘোচায় ইংরেজদের কার্যসিদ্ধি হয় না। এরপর ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতে উপস্থিত হন এদেশীয় ভাষায় দক্ষ ক্যাপ্টেন হকিন্স। অনেক চেষ্টার পর সুরাটে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের স্বত্ব পেলেও পর্তুগিজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাঁকে বিফল হতে হয়। এরপর ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন স্যার টমাস রো। মোঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের (১৫৬৯-১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ) কাছে তাঁর বিনীত আবেদন ছিল দুটি---প্রথমত ইংরেজ বণিকেরা যাতে মোঘলদের রাজত্বে নির্বিবাদে বাণিজ্য করতে পারে সম্রাটের কাছ থেকে তার আদেশ, আর দ্বিতীয়ত যে সকল মোঘল কর্মচারীরা সুরাটে ও অন্যান্য জায়গায় ইংরেজ কর্মচারীদের থেকে জবরদস্তিতে অর্থ শোষণ করছিল তার প্রতিকার। কার্যসিদ্ধি হবার পর তিনি স্বদেশে ফিরে যান। এরপর ইংরেজ কোম্পানি সুরাটে নিজেদের ব্যবসার উন্নতি করতে থাকে। ব্রিটিশ বণিকদের মনোভাবের পরিচয় জন হেলস ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর টমাস মান প্রমুখ ইংরেজদের অর্থনৈতিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে লিখিত ও ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে

প্রকাশিত 'England's Treasure By Forraign Trade' গ্রন্থে টমাস মান (১৫৭১-১৬৪১ খ্রিস্টাব্দ) লেখেন :

> 'The ordinary means to increase our wealth and treasure is by Forraign Trade, wherein wee must ever observe this rule : to sell more to strangers yearly than wee consume of theirs in value.'[৮]

এই উক্তির মধ্যেই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ বণিক-তন্ত্রের অকৃত্রিম বণিক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর করমণ্ডল উপকূলেও বাণিজ্য জমে উঠতে থাকে। ঘটনাচক্রে ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রথম দুর্গ নির্মিত হয়। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন :

> 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা স্থির করিলেন সমুদ্রতীরবর্তী কোন বাণিজ্যোপযোগী স্থান কিনিয়া লইয়া বা জমা করিয়া আত্মরক্ষার জন্য একটি ছোটখাট কেল্লা নির্মাণ না করিলে আর কোনমতেই শ্রেয়ঃবোধ হইতেছে না...ইংরাজ ফ্যাক্টরির প্রেসিডেন্ট...অনেক চেষ্টায় ভারতের পূর্ব উপকূলে একখণ্ড জমির সন্ধান পাইলেন। এই ভূমিখণ্ড চন্দ্রগিরির রাজার অধীন। ১৬৩৯ খ্রিঃ প্রচুর অর্থ দিয়া এই জমি ইংরেজ কোম্পানির অধ্যক্ষগণ জমা লইলেন।...উপকূলতীরস্থ সমুদ্রমুখী জমির একাংশে দুর্গ নির্মিত হইল। চন্দ্রগিরির রাজার নাম শ্রীরঙ্গ। জমি ইজারা দেওয়ার সময় অন্যান্য স্বত্বের মধ্যে এই স্বত্ব রহিল যে এই নবনির্মিত বন্দরটির নাম তাঁহার নামানুসারে 'শ্রীরঙ্গরাজপত্তনম্' নাম হইবে।'[৯]

এভাবে ক্রমশ সুরাট ও মাদ্রাজে ইংরেজ আধিপত্য বেড়ে উঠতে থাকে। অন্যদিকে বোম্বাইয়ের প্রতিও ইংরেজ বণিকদের দৃষ্টি ছিল। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের রাজকন্যার সঙ্গে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহ হলে যৌতুক রূপে তিনি বোম্বাই লাভ করেন। কিন্তু পর্তুগিজরা সেখানে জাঁকিয়ে বসে থাকায় যৌতুকের সম্পত্তি অধিকার করতেও ইংরেজদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। শেষ পর্যন্ত এক রাজকীয় সনদের বলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বোম্বাই লাভ করে। স্থির হয় কোম্পানি ইংরেজ রাজসরকারে বার্ষিক দশ পাউন্ড করে খাজনা দেবেন।

আসলে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে ইংরেজদের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পর্তুগিজরা। ইংরেজ বণিকদের ধ্বংস সাধনে তাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু ভাগ্য সহায় থাকায় ইংরেজ বণিকেরা শুধু বাণিজ্যে জয়লাভ করল তা নয়, কালক্রমে

এদেশের অধীশ্বর হয়ে উঠল। তাদের আগে পর্তুগিজরা ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক শক্তি। এমনকি বঙ্গদেশেও তারা যথেষ্ট শক্তি-সঞ্চয় করেছিল। সম্রাট আকবরের (১৫৪২-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ) সময়ে তারা বঙ্গদেশে বাণিজ্য শুরু করে। তখন বাংলাদেশে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল সপ্তগ্রাম। কিন্তু কালচক্রে সরস্বতী নদীর স্রোত-মান্দ্য দেখা দিলে বন্দর আর বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে সপ্তগ্রামের মহিমা কমতে থাকে। পর্তুগিজরা তখন ব্যান্ডেলে বাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করতে থাকে। আগেই বলা হয়েছে বাণিজ্যে প্রভুত্ব বিস্তারের পাশাপাশি তারা এদেশবাসীর ওপর নানাভাবে অত্যাচার করত। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর পর্তুগিজদের দমনে রাখার চেষ্টা শুরু হয়। বঙ্গের শাসনকর্তা ইসলাম খাঁ, কাশেম খাঁ, ইব্রাহিম খাঁর প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিশেষ একটি ঘটনা পর্তুগিজদের সৌভাগ্য-সূর্য অস্তমিত হবার জন্যে দায়ী বললে ভুল হয় না। মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাদা খুর্‌রম (আগামীর মোঘল সম্রাট শাহজাহান) একবার পিতৃ-দ্রোহী হয়ে পর্তুগিজদের কাছে সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন। হুগলীর তৎকালীন গবর্নর Michael Rodriques তৎকালীন মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কোপে পড়ার ভয়ে সম্রাট-পুত্রকে সাহায্য করতে চাননি। বিফল মনোরথ এই খুর্‌রমই যখন পরে ভারতের সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হন তখন তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং পর্তুগিজদের সমূলে উচ্ছেদ করার আদেশ দেন ।

শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের ফেরেই পর্তুগিজদের পতন হল। সরস্বতী নদীর মজে আসার কারণে সপ্তগ্রামের ভাঙন হয়ে উঠল অনিবার্য। সম্রাটের আদেশে সমস্ত দপ্তর উঠে এলো হুগলীতে। প্রচলিত গল্পকথা থেকে জানা যায় শাহজাদা সুজা বলেছিলেন একহাতে কৃপাণ আর আরেক হাতে ক্রুশ কাঠ নিয়ে পর্তুগিজরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। অজস্র হীরে মুক্তো মাণিকের খোঁজ পেয়ে তারা প্রথমে ক্রুশ কাঠ ফেলে দিয়ে কেবল থলি ভরতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একহাতে না পেরে কৃপাণটাও ফেলে দিলে। তারই ফলে পরবর্তীকালে যারা এলো তারা পর্তুগিজদের সহজে দমন করে নিজেদের অধিকার বিস্তৃত করতে পারল। সমালোচক যথার্থই জানাচ্ছেন :

> ‘সপ্তগ্রামের হারানো জৌলুস হুগলীতে যখন একটু একটু করে জ্বলতে শুরু করলো---ঠিক সেই সময়ে পরাজিত পর্তুগীজদের পাদপীঠে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের এক নতুন বাণিজ্য নাট্যের শুভ উদ্বোধন পর্ব চলছে পুরো-দমে।’[১০]

একথা মানতেই হবে যে পর্তুগিজদের বিনাশ ইংরেজদের পক্ষে যথেষ্ট ফলদায়ী হয়েছিল। বাণিজ্য ক্ষেত্রের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বীর অপসারণের ফলে ইংরেজদের পক্ষে কাজ হয়ে গিয়েছিল তুলনামূলক ভাবে সহজ। এরপর বাকিদের প্রতিযোগিতা থেকে অপসারিত করে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করা ছিল কেবল উপযুক্ত সময়ের

অপেক্ষা। বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের যে স্বপ্ন ইংরেজরা দিনরাত লালন করত হঠাৎ করেই সে সুযোগও এসে পড়ল। সম্রাট শাহজাহানের কন্যা গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হলে ইংরেজদের সুরাট কুঠির চিকিৎসক গ্যাব্রিয়েল বোটন তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। এই দুর্ঘটনার সময়কাল নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। 'কলিকাতা কল্পলতা'তে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৩৪ ইং অব্দের উল্লেখ করলেও ১৬৪৩, ১৬৪৫, ১৬৫২ ইত্যাদি নানা সনের উল্লেখ এ প্রসঙ্গে পাওয়া যায়। 'কলিকাতা কল্পলতা' থেকে আরও জানা যাচ্ছে সম্রাটের কন্যা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সম্রাট বোটনকে বলেন :

> 'তোমার ইচ্ছানুসারে আমি পুরস্কার করিব, অতএব তোমার কি ইচ্ছা কহ।' উদারচিত্ত স্বদেশহিতৈষী বোটন বলেন "আমার আত্মস্বার্থে কিছু প্রার্থনা নাই। আমার দেশীয় লোকেরা বাঙ্গালাদেশে শুল্কবিরহে বাণিজ্য করিবার জন্য বাণিজ্যালয় স্থাপনের অনুমতি পাইলেই আপনাকে প্রভূত রূপে জ্ঞান করিব।'[১১]

এভাবেই শুরু। ইতিমধ্যে সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা (১৬১৬-১৬৬১ খ্রিস্টাব্দ) বাংলাদেশের অধিকর্তা হয়ে আসেন। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে এ বিষয়ে জানা যাচ্ছে :

> 'শাহজাদা সুজা বাংলার সুবাদার ছিলেন ১৬৩৯ খ্রিঃ থেকে ১৬৪৭ খ্রিঃ, দ্বিতীয়বার ১৬৪৮-১৬৫৮ খ্রিঃ।'[১২]

সুজার অন্তঃপুরের কোন অসুস্থ মহিষীকেও বোটন সাহেব সুস্থ করেন বলে কথিত আছে। আবারও সম্রাটের কাছে পারিশ্রমিক হিসেবে বাণিজ্যাকাঙ্ক্ষী জাতির প্রতিনিধি বোটন দাবী করেন বাংলাদেশে বাণিজ্য করার স্বাধীন অধিকার। শাহ সুজা সম্মত হলে স্থির হয় প্রতি বছর তিন হাজার টাকা খাজনা দিয়ে সারা বাংলাদেশে ইংরেজরা অবারিত বাণিজ্য করতে পারবে। শ্রীপান্থ জানাচ্ছেন :

> 'ভারতের এ তল্লাটেও যথারীতি সকলের আগে পৌঁছেছিল পর্তুগীজরা। তারপর ডাচরা। ইংরেজরা সকলের শেষে। এই মুলুকে ইংরেজের প্রথম ফ্যাক্টরি ওড়িশায় মহানদীর ব দ্বীপে একটি তুচ্ছ বিন্দুতে ১৬৩৩ সালে। তারপর সেখান থেকে বালাসোর এ। এক পা এক পা করে ১৬৫১ সালে হুগলিতে, '৫৮সালে কাশিমবাজারে। ক্রমে পাটনা, সিংগিরা এবং ১৬৬৮ সালে ঢাকা।'[১৩]

এসব কেন্দ্রের তদারকির দায়িত্ব ছিল মাদ্রাজ কাউন্সিলের। সেন্ট জর্জ থেকে ব্যবসা পরিচালনা করা হত। তবে বিনা আয়াসে এসব সম্ভবপর ছিল না। ইংরেজদের অনেক

বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছিল। মোঘল সিংহাসনে বারবার শাসক-বদল, বারবার ক্ষমতার হস্তান্তর তাদের ভাগ্যচক্রেও আনছিল কখনো উত্থান, কখনো পতন। শাহজাহানের পর ঔরঙ্গজেব ক্ষমতা অধিকার করলে শাহসুজার শোচনীয় পরিণতি হয় এবং বঙ্গদেশের শাসক হন মীরজুমলা (১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ)। আর এই অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ নিয়ে ফৌজদার সহ শাসকগোষ্ঠীর স্থানীয় প্রতিনিধিরা প্রায় সকলেই নানাবিধ অসঙ্গত দাবিদাওয়া তুলে ইংরেজদের বিপদগ্রস্ত করে তোলে। তারা জানায় সুজার অবর্তমানে সুজার প্রদত্ত সনদ অর্থহীন। ইংরেজরা এসব কারণে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বর্ণপ্রসূ বাংলার অফুরন্ত সম্পদের কথা ভেবে ব্যবসায়ীর সজাগ মন বাংলার মাটি কামড়ে পড়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে স্থির করে।

এরপর বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন সায়েস্তা খাঁ (কার্যকাল ১৬৬৪-১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দ)। 'কলিকাতা কল্পলতা' থেকে জানা যাচ্ছে :

> 'নবাব সায়েস্তা খাঁর অধিকারকালে...ইংরাজরা ভাগীরথী বাহিয়া হুগলী নগরীর নিকট জাহাজ লইয়া যাইতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হন।'[১৪]

কিন্তু সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে ইংরেজদের মনোমালিন্য লেগেই থাকে। নবাব ঘোষণা করেন ইংরেজদের 'বাণিজ্য সম্পত্তি মাত্রের মূল্য অনুসারে শতকরা ৩।।০ টাকা কর' দিতে হবে। এর আগে ইংরেজরা 'বার্ষিক তিন সহস্র টাকা মাত্র দিয়া নিস্তার পাইতেন।'[১৫] এখন অতিরিক্ত অর্থের দাবী ইংরেজরা মানতে রাজি হয় না। নানা বিষয় নিয়ে দু পক্ষের মধ্যে অসন্তোষ জমে ওঠে। এরই মধ্যে তুচ্ছ একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে হুগলিতে নবাব-পক্ষ ও ইংরেজদের মধ্যে অশান্তি বেধে যায়। যে যুদ্ধের আয়োজন চলছিল, সেই আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে।

এই সময় হুগলির কুঠিয়াল ছিলেন জোব চার্নক। কলকাতার নগরায়নের সঙ্গে যাঁর নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রথম জীবনে চার্নক ছিলেন কাশিমবাজার কুঠির একজন জুনিয়র মেম্বার, সেখান থেকে তিনি পাটনায় যান। তারপর আবার আসেন কাশিমবাজারে। তারপর হুগলিতে কাউন্সিলে আসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। আর তখনই কুঠিয়ালদের সঙ্গে স্থানীয় রাজকর্মচারীদের তুমুল অশান্তি হয়। দু-পক্ষে একদফা খণ্ড প্রলয়ের পর প্রবল প্রতাপান্বিত মোঘল সম্রাটের প্রতিনিধির সঙ্গে ইংরেজ পক্ষের যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। যুদ্ধের অর্থই সর্বতোভাবে বাণিজ্যের ক্ষতি। সর্বোপরি অনতি অতীতে প্রবল পরাক্রমশালী মোঘলরা পর্তুগিজদের যেভাবে পর্যুদস্ত করেছিল তার স্মৃতি ইংরেজরা ভোলেনি। সুতরাং কিছুটা হাঙ্গামার পর উভয়পক্ষ থেকেই যুদ্ধ স্থগিত রাখা হয়। চিঠিপত্র লেখালিখি চলতে থাকে। নবাবের উদ্দেশ্য ছিল এভাবে কৌশলে কালক্ষয় করে ঢাকা থেকে সৈন্যদল আসা অবধি অপেক্ষা করা। এদিকে সাময়িক জয়লাভ হলেও ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত চার্নক হুগলি ছেড়ে পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচনা

করেন। সুতরাং জাহাজে মালপত্র নিয়ে হুগলি পরিত্যাগ করে চার্নক চলে যান বালেশ্বরের কুঠি অভিমুখে। সেই সময়েই মাঝপথে তাঁরা সুতানুটিতে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। তবে সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে মিটমাট না হওয়ায় ইংরেজরা কোথাও স্থিতি লাভ করতে পারছিল না। সন্ধিপত্র অ-স্বাক্ষরিত অবস্থায় ফিরে এলে চার্নক বুঝলেন যুদ্ধ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। সুতানুটি ত্যাগ করে যাবার সময় মেটিয়াবুরুজে বাদশাহি নিমকমহলে আগুন দিয়ে, থানা দুর্গ দখল করেছিল ইংরেজরা। চার্নক ক্যাপ্টেন নিকলসনকে পাঠালেন হিজলি অধিকার করতে। হিজলি তখন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর জায়গা ছিল। প্রচলিত প্রবাদ ছিল :

‘একবার খেলে হিজলি পানি, যমে মানুষে টানাটানি।’

হিজলির শাসক মালিক কাসেম ইংরেজ সেনাদের ভয়ে রণে ভঙ্গ দিলে ইংরেজরা সহজেই হিজলি অধিকার করে। কিন্তু সায়েস্তা খাঁ তাদের হিজলি থেকে তাড়াবার জন্যে প্রচুর সৈন্য প্রেরণ করেন। একদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, অন্যদিকে নবাবের সৈন্যদলের সঙ্গে সংগ্রাম---সব মিলিয়ে ইংরেজদের তখন শোচনীয় অবস্থা। যাই হোক, ঘটনাচক্রে উভয়ের মধ্যে সন্ধি-প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সন্ধিপত্র সায়েস্তা খাঁর স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ইংরেজদের উলুবেড়িয়া অবধি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে ইংরেজদের বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হতে থাকে। চার্নক তখন সুতানুটিতে থিতু হয়ে বাণিজ্য করার চিন্তা করতে থাকেন, কারণ হুগলীর পরিস্থিতি তখনো উত্তপ্ত। যদিও চার্নকের প্রস্তাব তখন কারো মনের মতো হয়নি। বিলেতের কোম্পানির কর্তারা এজন্য চার্নককে তিরস্কারও করেন। কারণ চার্নক তাদের কথামতো চট্টগ্রামের দিকে যাননি। এদিকে বিলেত থেকে চিঠি নিয়ে আসেন ক্যাপ্টেন হীথ (কার্যকাল ১৬৮৯-১৬৯১ খ্রিস্টাব্দ)। সেই আদেশবলে সুতানুটির সাময়িক আবাস ত্যাগ করে ইংরেজরা চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু চট্টগ্রাম দুর্ভেদ্য হওয়ায় হীথের নির্দেশে সমগ্র বাহিনী মাদ্রাজের দিকে এগোতে থাকে। চার্নকও অগত্যা মাদ্রাজে ঘাঁটি গাড়েন। এদিকে মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব (১৬১৮-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ) দেখলেন ইংরেজদের উচ্ছেদ করার অর্থই রাজকোষের বিপুল ক্ষতি। তাছাড়া ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে অশান্তি বাড়ালে তারা সমুদ্রগামী জাহাজে লুটপাট করতে পারে, মক্কা যাত্রীদের ক্ষতিসাধন করাও অস্বাভাবিক নয়। কাজেই সবদিক ভেবে চিন্তে ইংরেজদের তিনি কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে বাংলার শাসক হলেন ইব্রাহিম খাঁ, শান্তিপ্রিয় শাসনকর্তা, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষপাতী। তাঁর আমলে ইংরেজরা আবার বাংলায় ব্যবসা করতে ফিরে এলেন। সম্রাটের নিশান নিয়ে পূর্বোক্ত ক্ষমতা সহ ইংরেজদের বাণিজ্য-যাত্রা পুনরায় শুরু হল। শ্রীপান্থের ভাষায় :

> 'চার্নক আবার ফিরে এলেন বাংলায়। কিন্তু হুগলিতে নয়, সুতানুটিতে। সেদিন ২৪ আগস্ট ১৬৯০। ইতিমধ্যে ওঁরা মনে মনে লোফালুফি করেছেন আরও কটি জায়গা নিয়ে। চট্টগ্রামের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। কথা উঠেছিল হিজলি এবং উলুবেড়িয়া সম্পর্কেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহাল রইল সুতানুটির প্রস্তাব।'[১৬]

চার্নকের এই নিয়ে তৃতীয়বার সুতানুটিতে আগমন। হুগলি, হিজলি, উলুবেড়িয়া সব জায়গা ভালো করে পরীক্ষা করে অভিজ্ঞ চার্নক বুঝেছিলেন সুতানুটিই হচ্ছে ইংরেজ বাণিজ্যের সঠিক স্থান। বিনয় ঘোষ জানাচ্ছেন :

> 'যে মন নিয়ে চার্নক সুতানুটিতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে ভবিষ্যৎ কলকাতা মহানগরের ভিত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই মন হল পাশ্চাত্য বণিকের সজাগ ব্যবসায়ীর মন। নিরাপদ বাণিজ্যে আর্থিক মুনাফার হিসেব ছাড়া কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার মনে সেদিন আর কোনও মানবিক সুচিন্তা উদ্ভাসিত হয়নি।...বণিকের লাভলোকসানের মানদণ্ডে কলকাতার দাঁড়িপাল্লা নিঃসন্দেহে লাভের দিকে বেশি ঝুঁকেছিল,...তিনদিকে গড়খাইয়ের মতো নদীবেষ্টিত এবং সমুদ্রের কাছাকাছি এরকম সুরক্ষিত বাণিজ্যবন্দর উত্তরভারতে দুর্লভ ছিল। তাছাড়া সোনার বাংলার অফুরন্ত সম্পদের আকর্ষণও নেহাত কম ছিল না।'[১৭]

'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার' লিখছে কলকাতাকে বাংলার ব্রিটিশ বাণিজ্যের কেন্দ্র রূপে নির্বাচন করার পেছনে অনেক কারণ ছিল। গবেষক সুনীলকুমার মুনশি জানাচ্ছেন :

> 'হুগলি নদী গাঙ্গেয় উপত্যকার সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যকে ধরে রেখেছিল এবং কলকাতার অবস্থান ছিল সর্বোচ্চে যেখান থেকে হুগলি নদী সমুদ্র পর্যন্ত যথেষ্ট নাব্য ছিল।'[১৮]

মনে রাখতে হবে ইতিমধ্যে সরস্বতী নদী তার নাব্যতা হারানোয় পর্তুগিজদের 'পোর্ট পিকানো' অর্থাৎ ছোট স্বর্গ হিসেবে পরিচিত সপ্তগ্রামের অপমৃত্যু ঘটেছিল। সুতরাং সপ্তগ্রামের শ্রীহীনতার ফলস্বরূপ সেখানকার বস্ত্র ব্যবসায়ীরা ক্রমশ কলকাতা অভিমুখে এগিয়ে আসছিল। 'কলিকাতা কল্পলতা' থেকে জানা যাচ্ছে সপ্তগ্রামের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শেঠ ও বসাকরাও 'সপ্তগ্রাম ও হুগলীর প্রতিভা হ্রাস হইলে কলিকাতায় আসিয়া বড়বাজারে বসবাস করিতে লাগিলেন---অভিপ্রায় এই যে সরস্বতী মন্দা পড়িয়া গেলে ভাগীরথী প্রবলা থাকায় ইউরোপীয়েরা সেই নদী হইয়া আগমন পূর্ব্বক বাণিজ্য-ব্যবসা করিবেন---সুতরাং যত অগ্রসর হইয়া থাকা হয় ততই উভয় পক্ষের মঙ্গল।'[১৯] '২২'৩৪'

উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮.২৪' পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত কলকাতা ছিল সমুদ্র থেকে ১৩৮ কিলোমিটার দূরবর্তী। 'ভারতকোষ' থেকেও জানা যাচ্ছে :

> 'সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধিশালী গোষ্ঠীর মধ্যে বসাক ও শেঠ উপাধিধারী চারটি তন্তুবায় পরিবার ছিল অন্যতম। তাহারা আদি নিবাস ত্যাগ করিয়া হুগলীর দক্ষিণে চারিদিকের জঙ্গলের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জায়গায় গোবিন্দপুর নামে এক নূতন গ্রামের পত্তন করিল এবং অপর কয়েকটি তন্তুবায় পরিবারকে আহ্বান করিয়া সেখানে এক বৃহৎ উপনিবেশ গড়িয়া তুলিল। এই গ্রাম গার্ডেনরীচের সমীপবর্তী বলিয়া পর্তুগীজদের সঙ্গে বাণিজ্যের সুযোগও বর্ধিত হইল। কালক্রমে এই বসাক ও শেঠদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই গড়িয়া ওঠে কলিকাতার উত্তরে সুতানুটি হাট নামে এক বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র।'[২০]

এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ক্রমশ সুতানুটি অঞ্চলে একটা বৃহৎ বাণিজ্যিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠছিল এবং বাণিজ্য ধারার এই সূত্রই ইংরেজদেরও টেনে এনেছিল সুতানুটির দিকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বাণিজ্য ও নিরাপত্তার প্রশ্নে এই কলকাতা ভারতের অন্য সব বাণিজ্য বসতি-কেন্দ্র থেকে এগিয়েছিল। এখানে নামমাত্র খরচে বাণিজ্যিক পণ্য আমদানি রপ্তানি করা যেত। সুতানুটি–কলকাতায় যে সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে, তার মূলে এই অঞ্চলের অবস্থানগত গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায়না। কবি কিপলিং কলকাতাকে যতই 'Chance–directed, Chance-erected'[২১] বলুন না কেন, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং কালিক পরিস্থিতি সবই সেদিন কলকাতার অনুকূলে ছিল। বিশেষত হুগলী নদীর পূর্বতীরের এই অঞ্চল মারাঠা আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত ছিল, কারণ এদিকে আসতে হলে খরস্রোতা গভীর নদীপথ অতিক্রম করতে হত। তাছাড়া এখানে শেঠ–বসাকদের অবস্থানের ফলে ইংরেজদের রপ্তানির উপযুক্ত জিনিস এখানে সহজলভ্য ছিল। মোগলদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কাটাও কিছুটা দূরীভূত হয়েছিল। এখান থেকে মোগল শাসন-কেন্দ্র কিছুটা দূরে (হুগলিতে) অবস্থিত হওয়ায় এবং এখান থেকে সমুদ্রসঙ্গম কাছে হওয়ায় বিপত্তি বুঝলে জলপথে নিষ্ক্রমণের পথ খোলা থাকল, তাছাড়া পূর্বদিকের উচ্চভূমিতে দুর্গ নির্মাণের সুবিধা হতে পারে--- এই সব কিছু ভেবেই চার্নক সিদ্ধান্ত নেন এটাই হবে ইংরেজদের বাণিজ্যের সঠিক স্থান। যদিও কলকাতার আবহাওয়া তখন ইংরেজদের পক্ষে যথেষ্ট প্রতিকূল ছিল। সেখানে রীতিমত সংগ্রাম করেই বেঁচে থাকতে হত। সেকালের কলকাতার পরিস্থিতি খুব একটা সুবিধাজনক ছিল এমন কথা বলা যায় না। সমালোচক 'Atkinson's poem' থেকে শহরের তৎকালীন পরিস্থিতি ব্যক্ত করেছেন :

> 'Calcutta! What was thy condition then?
> An anxious, forced existence, and thy site
> Embowering jungle, and noxious fen,
> Fatal to many a bold aspiring wight :
> On every side tall trees shut out the sight;
> And like the Upas, noisome vapours shed;
> Day blazed with heat intense, and murky night
> Brought damps excessive, and a feverish bed;
> The travellers at eve were in the morning dead.'[২২]

বিভিন্ন রচনা থেকে জানা যাচ্ছে মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জের কর্তাব্যক্তিরা ১৬৯১ সালের ২০ নভেম্বর বিলেতে পরিচালন সমিতির কাছে চার্নক ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে লিখেছিলেন :

> 'মৃত্যুর কারণে সুতানুটিতে মাত্র চল্লিশ জন ইউরোপীয় সেনা পড়ে আছে। সুতানুটির মত নিরাপত্তা-হীন স্থান থেকে আমরা বিন্দুমাত্র উপযোগিতা আশা করিনা। তথাপি সমস্ত যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি সেখানে বসবাস অব্যাহত রেখেছেন।'[২৩]

একথা ঠিক যে যখন চার্নক কলকাতায় বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট পদার্পণ করেন তখন সেখানে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল নানা প্রতিকূলতা। মাথা গোঁজার উপযুক্ত স্থান ছিল না, আবহাওয়া অনুকূল ছিল না। কতকগুলি সামান্য কুটিরে প্রাথমিকভাবে তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা হয়। এটিই কলকাতা মহানগরের প্রথম কেন্দ্রক বললে ভুল হয় না। গবেষক বিনয় ঘোষ বলছেন :

> 'সুতানুটির গঙ্গাতীরে কতকগুলি তাঁবু, কুঁড়েঘর ও নৌকা নিয়ে যোব চার্নক যখন প্রায় বন্য যাযাবরের মত বাস করছিলেন তখন অবশ্য তাঁর সপ্তদশ শতকী কল্পনার দিগন্তেও কলকাতার বর্তমান মেট্রোপলিটন মূর্তি ভেসে ওঠেনি। They live in a wild unsettled condition at Chuttanuttee neither fortifyed houses nor godowns,only tents, hutts and boats (May 1691).'[২৪]

সমালোচক চার্নকের কলকাতায় পদার্পণের এবং কুঠি স্থাপনের সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে বলছেন :

> 'The day when Job Charnock, sitting under the shade of a big peepul tree at a place now known

> as Baitackkhana Bazar, smoked meditatively his favourite hookah and selected Calcutta as a most convenient site for the trading purposes of the English merchants, whose agent he then was, little did he calculate that he was practically laying the foundation of a great Empire for his countrymen....when Job Charnock made his choice, it was remote even from the dreams of the most farsighted man that Calcutta would become the capital of the British Indian Empire.'[২৫]

সামনে অনিশ্চিত দিন, তবু চার্নক নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তাঁর কলকাতাকে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে নির্বাচনের প্রসঙ্গে নিখিল সুর সি আর উইলসনের বক্তব্য তুলে ধরেছেন :

> 'And Charnock chose not only deliberately, but also wisely. আর কলকাতা সম্পর্কে উইলসন বলছেন Not only was it strategically safe but it was an excellent commercial centre.'[২৬]

এভাবেই সেদিন ঘটে গিয়েছিল জব চার্নকের দূরদৃষ্টি ও কলকাতার নিয়তির মধ্যে সেতুবন্ধন। নানা সঙ্কটের মোকাবিলা করে ইংরেজরা কলকাতায় বাণিজ্য বসতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল, যেটি এক বাস্তব সত্যকে নির্দেশ করে। সমালোচকের মতে :

> 'It is unquestionable that by British Statesmanship, courage and firmness, England has been able to secure for herself her great Indian Empire here, in Calcutta, events of momentous consequence have been enacted which form an important chapter in the history of the world.'[২৭]

প্রবল শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অল্প সংখ্যক ইংরেজ যেভাবে অসম্ভব কষ্ট সহ্য করে সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করতে সমর্থ হয়েছিল সেটা ইংরেজদের চারিত্রিক দৃঢ়তারই সাক্ষ্য দেয়। আর এটাই ছিল আগামী দিনে ভারতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম চাবিকাঠি। সি. আর. উইলসন যথার্থই বলেছেন :

> '...the final settlement of the English on the east bank of the hughli was the fruit of more than

> half a century of efforts, the achievement of a band able and resolute men...An empire is not gained like a prize of lottery.'[২৮]

স্থায়ীভাবে ফ্যাক্টরি-গৃহ স্থাপনের স্থান না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কেমনভাবে ছিলেন তার কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে---The Right Worshipful Agent Charnock, Mr. Francis Ellis and Mr. Jeremiah Peachie duly resolved :

> 'inconsideration that all the former buildings here and are destroyed to build as cheap as possible a warehouse. a dining-room, a cook-room, a room to sort cloth in, an apartment for Company's servants and a guard house, also a house for Mr.Ellis. The Agent's and Mr. Peachie's houses which were part standing to be repaired as also the secretary's office–these to be done with mud walls and thatched houses till we can get a ground whereon to build a factory.'[২৯]

তবে সুতানুটি–কলকাতা চার্নকের দূরদৃষ্টিকে ব্যর্থ হতে দেয়নি। ১৬৯২ খ্রিস্টাব্দে চার্নকের মৃত্যু হলেও সুতানুটির সমৃদ্ধি দেখে উল্লসিত হয়ে কোম্পানির ডিরেক্টরদের পরে লিখতে হয় :

> 'We are glad to hear your town of Chuttanuttee increses so exceedingly.'[৩০]

সেই থেকে ক্রমে 'এই নগরের শোভা ও প্রতিভা পদ্মবনের ন্যায় অতি অল্পকালের মধ্যে বর্ধিত হইয়া উঠিল।'[৩১]

বাণিজ্য করতে গেলে যেমন গুদাম প্রয়োজন, ফ্যাক্টরি প্রয়োজন, তেমনি সেসব প্রয়োজনীয়তার কথাও ইংরেজরা ভোলেনি। বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে কোম্পানির এজেন্ট ও গভর্নর উইলিয়ম হেজেস (১৬৮২-৮৪ খ্রিস্টাব্দ অবধি দায়িত্বভার) বিলেতের কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন :

> 'We must resolve to quarrel with people (Mughal officials) and build a fort on the island of sagour, at the mouth of the river...'[৩২]

হুগলি নদীর মোহনায় সুরক্ষিত বন্দর ও দুর্গ গড়ে তুলে অন্যান্য শক্তির শোষণ থেকে বাণিজ্যকে রক্ষা করার এই প্রয়াস অনেকদিন ধরেই চলছিল। আমাদের মনে রাখতে

হবে কলকাতার নগরায়নের সূচনা হয়েছিল বাণিজ্যের স্বার্থে। তাই প্রথম পর্বে কোম্পানির দুর্গ নির্মাণের প্রয়াসও ছিল একান্তভাবেই বাণিজ্যিক প্রয়োজন। শাসনকর্তা হওয়ার জন্য এমনটা ঘটেনি বলেই মনে করা হয়। তখনও বণিকের মানদণ্ডই ছিল তাদের একতম অবলম্বন। সমালোচক উল্লেখ করেছেন :

> ‘পরিচালক সমিতি হুগলীর এজেন্ট এবং কাউন্সিলকে স্পষ্টই জানিয়েছিল (২ জুলাই, ১৬৮৪), তাদের চিন্তার বিষয় শুধুমাত্র বাণিজ্য এবং নিরাপত্তা, দখল নয়। যেখানে নিরাপত্তার জন্য কোনও দুর্গ নেই, কোম্পানি সেখানে সাহসের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারবে না।’[৩৩]

আসলে সতেরো শতকে বিপুল সামরিক শক্তিধর মোগলদের সামনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সবদিক থেকেই ছিল নিতান্ত শিশু। তারা ভারতে এসেছিল বাণিজ্য করতে, সাধারণ বণিক হিসেবে নির্বিঘ্নে বাণিজ্য করার আশা নিয়ে। মোগল শাসকদের সঙ্গে বোঝাপড়ার মাধ্যমে বাণিজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতিই ছিল তাদের একমাত্র কাম্য। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝতে পেরেছিল তাদের রক্ষা করার সদিচ্ছা বা ক্ষমতা কোনোটাই মোগল সম্রাটের নেই। তাছাড়া মোগল সাম্রাজ্যব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীরা পর্যন্ত নানাভাবে কোম্পানিকে শোষণ করে নিজেরা মুনাফা লাভ করতে চাইত। কাজেই তাদের বাধা দিতে এবং বাণিজ্যের সুবিধা আদায় করার জন্য কোম্পানিকে কূটনীতির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। খোশামোদ করে, কৌশল করে, উৎকোচ দিয়ে, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে তারা শাসকের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব সুযোগ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ক্রমশ তারা উপলব্ধি করছিল এর কোনোটাই সঠিক পদ্ধতি নয়। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল :

> ‘We must protect ourselves, we must break with the Indian Government. We must seize some convenient post and fortify it.’[৩৪]

ভারতে ক্ষমতা অধিকার বিষয়ে ইংরেজ নীতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকের বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে :

> ‘পি জে মার্শালের (১৯৬৮) মতে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পীটের ভারত শাসন আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত ভারতে রাজনৈতিকভাবে স্থান দখলের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশের তরফে কোন সচেতন বা দৃঢ় প্রয়াস বা নীতি ছিল না।...মার্শাল বলেছিলেন “ভারতে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত এলাকা বৃদ্ধির পেছনে কোন পরিকল্পনা ছিল না, ব্রিটেনের থেকে কোন নির্দেশও ছিল না। ভারতে কর্মরত

> আধিকারিকেরাই উদ্যোগী হয়ে কর্মপন্থা স্থির করত। ভারতে স্থান দখলের ও উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে লন্ডন থেকে কোন নীতি নির্দেশ আসত না।...তবে মুঘল কর্তৃত্বের অবনতির ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা দেখা দেয়। সেই সুযোগে কোম্পানির পক্ষে রাজ্যবিস্তার করাও সহজ হয়েছিল।...ইংরেজ কোম্পানি আসলে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি বুঝে শুধু সুযোগের সদ্ব্যবহার করত এবং সেই অনুযায়ী পাল্টা জবাব দিত।'[৩৫]

চার্নকের মৃত্যুর পর প্রথমে এলিস ও তারপরে চার্লস আয়ার কলকাতার এজেন্ট হয়ে ওঠেন। মাদ্রাজ থেকে কোম্পানির কমিসরি-জেনারেল জন গোল্ডসবরো হুগলী তীরবর্তী একটা উঁচু জায়গা কুঠি নির্মাণের উপযুক্ত বলে স্থির করে ফেলেন। কিন্তু কোম্পানি তৎকালীন শাসকের কাছ থেকে দুর্গ তৈরির অনুমতি পায়নি। অবশেষে ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ শোভা সিংয়ের বিদ্রোহের সময় কোম্পানির সামনে এক অভাবিত সুযোগ উপস্থিত হল। শোভা সিংয়ের বিদ্রোহে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হলে বিদেশি বণিকেরা নিজেদের এলাকার নিরাপত্তার জন্য সুবাদারদের কাছে দুর্গ নির্মাণের আর্জি জানাল। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সুবাদার অনুমতি দিলেই ইংরেজরা গড়তে শুরু করল তাদের দুর্গ, নাম রাখল ফোর্ট উইলিয়ম। সে প্রসঙ্গে জানা যাচ্ছে :

> 'ঐ দুর্গ পূর্ব পশ্চিমে লালদিঘি হইতে ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত এবং উত্তর দক্ষিণে ক্লাইভ স্ট্রীট হইতে ঐ দিঘির উত্তরধার পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। ইংলন্ডাধিপতি তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে ঐ দুর্গ নির্মিত হওয়ায় ফোর্ট উইলিয়ম নামে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়।'[৩৬]

তবে এতদিন পর্যন্ত ইংরেজদের বসতির ভিত্তি পাকাপোক্ত ছিল না। ইংরেজরা ছিল মূলত জমির দখলদার। সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা তখন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারদের পরিবারের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই ইংরেজরা তিনখানা গ্রাম কিনে নিয়ে নিজেদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে চাইল। শেষ পর্যন্ত খোজা ইসরায়েল সারহেদ নামে একজন আর্মেনিয়ানের সহায়তায় ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের নাতি, তৎকালীন বাংলার সুবাদার আজিম-উস-শানের কাছ থেকে ১৬০০০ টাকা নজরানা উপঢৌকনের বিনিময়ে ইংরেজরা ঐ তিনটি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব অর্থাৎ খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করল। সমালোচকের বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে :

> 'In 1698 A.D., the East India Company purchased at Rs. 16000 only the villages of Sutanati,

Govindpur, and Calcutta with their districts extending about 3 miles along the eastern bank of the Hughli and about one mile inland.'[৩৭]

সমালোচক নিখিল সুর জানাচ্ছেন :

'C.R.Wilson তাঁর Indian Records Series গ্রন্থে 'সুতানুটি ডায়রি' থেকে যে তথ্য তুলে দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, জমিদারকে আদেশ করা হয়েছিল কোম্পানির হাতে তাদের অধিকারের দলিল বা দখলনামা তুলে দিতে। জমিদার এতে প্রচণ্ড আপত্তি তুললে স্থির হয় যে, ১৫০০ টাকা দিয়ে কোম্পানি দখলনামা নেবে। জাহাঙ্গীরের আমলে এই তিনটি গ্রাম ছিল খালসা জায়গির এবং মূল জায়গিরদার ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার। তাঁর বংশধর ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ বিদ্যাধর রায় একসময় সুতানুটি গ্রামে ইংরেজদের বসতি স্থাপন করতে এবং জমিদারি কাছারিটা ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।'[৩৮]

তাঁরই উত্তরাধিকারীরা তিনটি গ্রাম বিক্রি করেন ইংরেজদের কাছে। শ্রীপান্থ লিখছেন :

'১৬৯৮, ১০ নভেম্বর, ১৩০০ টাকায় কেনা হয়ে গেল জমিদারি। ইংরেজরা জমিদার হয়ে গেল কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুরের। বার্ষিক খাজনা ১১৯৫ টাকা। পত্তন হল কলকাতা মহানগরীর।'[৩৯]

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত অনুসন্ধান করে গবেষক নিশীথরঞ্জন রায় জানাচ্ছেন :

'সাবর্ণ চৌধুরীদের সঙ্গে সম্পাদিত এই অঙ্গীকার-নামাটি সংরক্ষিত রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। ইতিহাসখ্যাত এই দলিলটির একদিকে রয়েছে কাজীর সীলমোহর, অন্যদিকে জমিদারদের স্বাক্ষর। দলিলটি ফারসী ভাষায় লেখা। সম্পাদনার তারিখ হিজরি সন ১১১০ এর প্রথম জামাদির ১৫ তারিখ--- ইংরেজি ১০ নভেম্বর ১৬৯৮ খ্রিঃ। স্বাক্ষরকারী জমিদাররা--- মনোহর দেব, রামচাঁদ রাম বাহাদুর প্রাণ এবং মনোহর সিংহ সকলেই ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার (রায়চৌধুরী) এর বংশধর। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই মজুমদার উপাধিধারী রায়চৌধুরীরা কলকাতা পরগণার জমিদার বলে স্বীকৃত হয়ে আসছিলেন।'[৪০]

তবে জমিদারি লাভ করার পরেই যে ইংরেজরা দুর্গ গড়ে ফেলতে পেরেছিল তা নয়। অর্থাভাবের কারণে খুব দ্রুততার সঙ্গে দুর্গ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। নবাবের অনুমোদন লাভের পর দুর্গ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হতে প্রায় কুড়ি বছর সময় লেগেছিল। এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল প্রেসিডেন্সি টাউন হিসেবে কলকাতার মর্যাদা লাভ। শুরু থেকেই অঞ্চলটি ছিল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বা মাদ্রাজ সেটেলমেন্টের অধীন। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে এখানে প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন প্রেসিডেন্সি। তৃতীয় খণ্ডে উইলিয়ম (W.W. Hunter) লিখেছেন যে ১৭০৭ সালে 'The East India Company declared Calcutta a separate Presidency, accountable to the court of Directors in London' (p.241).[৪১] 'Calcutta City' বইয়ে অশোক মিত্র (১৯২৮-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ) এইচ বিভার্লের (V. H. Beverley) দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে লিখেছেন ১৭০৭ সালেই কলকাতা প্রেসিডেন্সি টাউনের মর্যাদা লাভ করেছিল। কিন্তু R. C. Sterndale 'An Historical Account of the Calcutta Collectorate' বইয়ে মন্তব্য করেছেন :

> 'In 1698 or 1699 Calcutta was raised to the rank of a Presidency and a President and Council of 4 members were appointed.'[৪২]

অর্থাৎ এখন থেকে কলকাতার কর্তারা কেবল লন্ডনের পরিচালন সমিতির কাছে দায়বদ্ধ রইলেন।

এবার ইংরেজরা একটু থিতু হওয়ার সুযোগ পেল। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যখনই জমিদারি লাভ করল তখনই তার কিছু অধিকারও জন্মাল। যেমন রাজস্ব আদায়ের অধিকার বা পতিত জমি বিলি করার অধিকার ইত্যাদি। ১৭০০ সালের শুরু থেকেই কলকাতা নিজের পায়ে ভর দিয়ে একটু একটু করে দাঁড়াতে শিখল। সমালোচক জানাচ্ছেন '১৭০০ সালের ২৭শে মার্চ পর্যন্ত বিলেতের ডিরেক্টরদের কাছে যে সমস্ত চিঠিপত্র গেছে তাতে সুতানুটিরই উল্লেখ করা হয়েছে বারবার।'[৪৩] তারপর থেকে কলিকাতা আর ফোর্ট উইলিয়ম এই নামই ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে ইংরেজদের কলিকাতা নামটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আগ্রহের একটা অন্যতম কারণ ছিল। সেটাকে একটা বাণিজ্যিক কৌশল বলা যেতে পারে। পর্তুগিজরা কালিকটে প্রথম ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেছিল। ইউরোপে কালিকটের জিনিসের খুব সুনাম এবং চাহিদা ছিল। কালিকট ও কলিকাতা শব্দদুটির মধ্যে বেশ সাদৃশ্য থাকায় কোম্পানি এই নাম ব্যবহারের দিকে ঝুঁকেছিল। তবে বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে অজস্র প্রতিকূলতা পেরোতে হয়েছিল ইংরেজদের। ১৬৯৯-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এক নতুন বিপত্তি ঘটেছিল, আর একটি নতুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে এসে হাজির হয়েছিল। নতুন কোম্পানির

নাম হয়েছিল 'English Company Trading to the East Indies', পুরনো কোম্পানি 'London Company' নাম গ্রহণ করেছিল। এর ফলে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। সম্রাটের রোষানলে পড়ে দুই কোম্পানিরই ব্যবসার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। শেষে দুবছর বাদে উভয় কোম্পানি মিলে যায়। তারপর নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল বাংলার নতুন দেওয়ান নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ (১৬৬৫-১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ)কে নিয়ে। তিনি ক্ষমতায় আসার পরেই সমস্ত ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের ফরমান তলব করলেন। এদিকে সুজার আমলের ফরমান হারিয়ে যাওয়ায় ইংরেজ কোম্পানি তখন ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কলিকাতা কল্পলতা থেকে জানা যাচ্ছে :

> 'মুর্শিদকুলি খাঁর অধিকারকালে ইংরাজেরা পুনর্বার প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন।...ইংরাজেরা নবাব সূজা খাঁ ও দিল্লীশ্বর আওরংজেবের স্থানে যে সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মুর্শিদকুলি খাঁ সেই সব হরণ-পূর্বক এদেশীয় বণিক দিগের তুল্য শুল্ক অথবা ভুরি ভুরি উপঢৌকন প্রদানে তাঁহাদিগকে বাধ্য করিলেন।'[৪৪]

এদিকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে দেশে একটা অরাজকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, ক্ষমতা দখলের জন্য সিংহাসন নিয়ে মহারণ শুরু হয়েছিল, আজিম-উস-শান পিতা শাহ আলমের সাহায্যার্থে সেনা সংগ্রহে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং ইংরেজ বণিকদের অর্থের জন্য অত্যন্ত পীড়ন করতে শুরু করেছিলেন। স্থানীয় প্রশাসকেরাও এই সুযোগে কোম্পানির থেকে অর্থ শোষণ করতে চেয়েছিল। তবে এই ডামাডোলের সুযোগে কোম্পানি নিজেদের দুর্গ মজবুত করতে সক্ষম হয়েছিল। ইতিমধ্যে পাটনার এজেন্টদের ওপর সুবাদারের অত্যাচার বেড়ে উঠলে কলকাতা কাউন্সিল এই অত্যাচারের প্রতিকার করার চেষ্টা করছিল। তারপর বাহাদুর শাহের সিংহাসন প্রাপ্তিতে সাময়িক শান্তি ফিরে এসেছিল। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হলে জাহান্দার শাহ ক্ষমতা অধিকার করেন, যদিও তাঁর শাসনকাল খুবই সীমিত (১৭১২-১৭১৩ খ্রিস্টাব্দ)। এরপর সিংহাসনে বসেন আজিম-উস-শানের দ্বিতীয় পুত্র ফারুখশিয়র (শাসনকাল ১৭১৩-১৭১৯ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর শাসনকালে ইংরেজদের একটি অসামান্য উপকার হয়েছিল, তা হল ফারুখশিয়রের কাছ থেকে ফরমান লাভ। মুর্শিদকুলির অত্যাচার মাত্রা ছাড়ালে কোম্পানি দিল্লির দরবারে নিজেদের আর্জি জানিয়ে প্রতিনিধি পাঠাল। দূত হিসেবে গিয়েছিলেন আরমানী খোজা সরহান্দ এবং ডক্টর উইলিয়ম হ্যামিলটন। এই দৌত্য সফল হয়েছিল। তার ফলেই কোম্পানি ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ফারুখশিয়রের কাছ থেকে লাভ করল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরমান যাতে কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার এবং জমিদারি কেনার অধিকার দেওয়া

হয়েছিল। এই ফরমান লাভ ছিল কোম্পানির একটি যথার্থ কূটনৈতিক সাফল্য। ইংরেজদের প্রার্থিত বিষয়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত স্বত্বগুলি ছিল প্রধান :

১) কলকাতার প্রেসিডেন্ট যে সব মালপত্রের জন্য ছাড়পত্র সই করে দেবেন সেগুলি বঙ্গীয় শাসন কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। এই ছাড়পত্র দেখে নবাবের কর্মচারীরা কোম্পানির বাণিজ্য সামগ্রী তল্লাসী না করেই ছেড়ে দেবে। এই ছাড়পত্রের সাহায্যে কোম্পানির জিনিসপত্র সর্বত্র বিনা বাধায় যেতে পারবে।

২) নির্দিষ্ট সময়ে মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল থেকে কোম্পানি নিজেদের মুদ্রা প্রস্তুত করিয়ে নিতে পারবে।

৩) ইউরোপীয় বা এদেশীয় কোনও ব্যক্তি যদি কোম্পানির কাছে ঋণী থাকে অর্থাৎ দেনাদার হয়, তাহলে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে কোম্পানি আবেদন করা মাত্র তারা সেই ব্যক্তিকে কলকাতা কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবে।

৪) কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ৩৮ খানা গ্রাম কেনার অধিকার কোম্পানি পাবে।

এই ৩৮টি গ্রাম হল যথাক্রমে :

১) সালকিয়া ২) হাওড়া ৩) কাসুন্দিয়া ৪) রামকৃষ্ণপুর ৫) ব্যাঁটরা ৬) দক্ষিণ পাইকপাড়া ৭) বেলগাছিয়া ৮) দক্ষিণদারি ৯) হগুলকুরিয়া ১০) উল্টাডিঙি ১১) সিমলা ১২) মাকন্দা ১৩) কামারপাড়া ১৪) কাঁকুড়গাছি ১৫) বাগমারি ১৬) আরকুলি ১৭) মির্জাপুর ১৮) শিয়ালদা ১৯) কুলিয়া ২০) ট্যাংরা ২১) শুঁড়া বা সুন্দা ২২) বাদসুন্দা ২৩) শেখপাড়া ২৪) ধলন্দা ২৫) বিরজি ২৬) তিলজলা ২৭) তোপসিয়া ২৮) সাপগাছি ২৯) চৌবাগ ৩০) চৌরঙ্গী ৩১) কলিঙ্গা ৩২) গোবরা ৩৩) বাহির দক্ষিণদারী ৩৪) শ্রীরামপুর ৩৫) জলা কলিঙ্গা ৩৬) গোঁদলপাড়া ৩৭) এন্টালি ৩৮) চিৎপুর।

মুর্শিদকুলি খাঁ বুঝতে পেরেছিলেন ৩৮টি গ্রাম ইংরেজরা পেলে তাদের যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হবে, গঙ্গার উভয় পারের প্রায় ৫ ক্রোশ স্থান তাদের অধিকারভুক্ত হবে, ফলে হুগলী নদীর ওপরেও তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই তিনি কৌশল করে গ্রামগুলির অধিকর্তাদের ভীতি প্রদর্শন করায় সহজে ইংরেজরা ওইসব গ্রামের অধিকার লাভ করতে পারেননি। কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁর নানা বাধাদান সত্ত্বেও তাঁর আমলে কলকাতার যথেষ্ট উন্নতি হতে থাকে। ফরমান লাভের পর থেকেই কলকাতাকে খাস ইংরেজ এলাকায় পরিণত করার উদ্যোগ নেয় কোম্পানি। কলকাতার জনসংখ্যাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। কোম্পানি সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতায় জমি প্রজা-বিলি করতে থাকে। প্রজা-বিলির হার ছিল বিঘা প্রতি তিন টাকা। কর্মচারী নিয়োগ করে কোম্পানি প্রথম থেকেই খাজনা আদায়ের ভার দিয়েছিল। প্রথম রালফ শেলডন নামে এক ব্যক্তি এই

কাজে নিযুক্ত হন। তিনিই কলকাতার প্রথম কালেক্টর। প্রত্যেক কালেক্টরের অধীনে একজন করে এদেশীয় সহকারী থাকতেন। শেলডনের সহকারী ছিলেন নন্দরাম সেন। পরবর্তীকালে এই পদাধিকারী হন গোবিন্দরাম মিত্র (দায়িত্ব-কাল ১৭২০-১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি 'ব্ল্যাক জমিদার' নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। এই কাজে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনিই চিৎপুরে বিশাল নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেটির উচ্চতা ছিল ১৬৫ ফুট। কিন্তু ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে এক ভয়ানক ঝড়ে মন্দিরটি নষ্ট হয়ে যায়। গবেষক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) জানাচ্ছেন :

> 'ঔপনিবেশিক বসতি রূপে কলকাতার ঐতিহাসিক আবির্ভাব যদিও সতেরো শতকের শেষে (যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও ডিহি কলকাতা---এই তিনটি গ্রামের ইজারা লাভ করে), শহররূপে কলকাতার ক্রমবিকাশ শুরু হয়---আঠারো শতক থেকে। লোকবসতি, বাজার প্রতিষ্ঠা, গৃহ নির্মাণ, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলে বেশ দ্রুতগতিতে, এই তিনটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, ব্যাপারীদের গঞ্জ থেকে একটি সুসংবদ্ধ শহরে পরিণত হচ্ছিল ঐ সময়ে।'[৪৫]

নগরায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সুনীল কুমার মুনশি জানাচ্ছেন :

> 'সাদামাটা অর্থে নগরায়ন হল নগর বা শহরে মানুষের ঘনীভবন। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়, যখন মানুষ বিভিন্ন কারণে তাদের প্রাথমিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করে কোনও সুবিধেজনক স্থানে জড়ো হয় আনুষঙ্গিক পেশার মাধ্যমে জীবন যাপনের পথ খুঁজে নিতে।'[৪৬]

কলকাতার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একথাও অনস্বীকার্য যে কলকাতার অর্থনৈতিক ও নাগরিক জীবনের ওপর ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ ছিল কলকাতা নগরের উত্থানের অন্যতম কারণ। কলকাতার উত্থানে বাণিজ্যের একটা বড় ভূমিকা ছিল। আঠারো শতকের বাংলায় যখন প্রবল বিশৃঙ্খলা চলছে, মোগল শাসন বিপর্যস্ত, চারদিকে অরাজকতা---সেই সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে সেই সময় অনেক মানুষের কাছেই কলকাতা নিরাপত্তা ও জীবিকা অর্জনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকেই কোম্পানির ডিরেক্টররা খুশি হয়েছিলেন এই দেখে যে 'It is enough our Cash feels the benefit. (26 February, 1703)'[৪৭]

গবেষক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন :

> '১৭১০ থেকে ১৭৫২-এর মধ্যে শহরের জনসংখ্যা দশ-বারো হাজার থেকে বেড়ে চার লক্ষে গিয়ে পৌঁছোয়। পরবর্তী চল্লিশ বছরে (১৭৮৯-৯০ সালের শেষে) ছয় লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়।'[৪৮]

প্রথমদিকে কোম্পানির নিরপেক্ষ ব্যবহার মানুষজনের মধ্যে আস্থা জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। চারপাশের অরাজক পরিস্থিতিতে একমাত্র কলকাতায় বসতি করলে কোম্পানির শাসনে তাদের বিষয় সম্পত্তি সুরক্ষিত থাকবে---এই বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছিল মানুষের মনে। রায় বাহাদুর প্রমথনাথ মল্লিক লিখেছেন :

> '১৭১১ খ্রিস্টাব্দে কয়েক মাস আহার্য বস্তু দুর্মূল্য হওয়ায় কোম্পানি দরিদ্র প্রজাগণের জন্য ৫০০ মণ চাউল বিতরণ করিয়াছিল।...উহাতে তাহাদের উপর সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইয়াছিল।'[৪৯]

নিরাপদ নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা ও নির্লিপ্ত অর্থোপার্জনের সুযোগ কলকাতার মত আর কোথাও তখন ছিল না। গবেষক বিনয় ঘোষ লিখছেন :

> 'ইংরেজরা ক্রমে ছোট জমিদার থেকে বড় জমিদার হয়ে উঠছেন এবং ধাপে ধাপে বাণিজ্যের অবাধ স্বাধীনতা লাভ করছেন। তাঁদের সুতানুটির বাণিজ্যকুঠি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে। গ্রাম থেকে নগরের রূপ ধারণ করেছে কলকাতা এবং রূপায়নের প্রথম পর্বে মধ্যযুগের নগরের যাবতীয় ঐতিহাসিক উপাদান নিয়েই তার বিকাশ হয়েছে। নগরের চারিদিকে প্রহরী মোতায়েন বেষ্টনী ও গড়খাই, পশ্চিমে নদীতীরে কেল্লা ও তার চারদিকে শত্রু মুখী কামান। কলকাতার বাল্যকালের এই রূপ ('The original town of Calcutta was at one time at least a fenced city...Every road issuing from the town was secured by a gate') প্রাচীন মানচিত্রে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।'[৫০]

নগরে বেশিমাত্রায় প্রাপ্ত স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় গ্রাম থেকে শহরমুখী হচ্ছিল মানুষের মন। নবাবি আমল আর ইংরেজ আমলের সামাজিক প্রতিবেশের ঐতিহাসিক পার্থক্য উপলব্ধি করতে মানুষের খুব একটা অসুবিধা হয়নি। নতুন কলকাতার নতুন হাওয়ার মধ্যে ছিল সেই পার্থক্যের আমেজ এবং নতুন জীবন উপভোগের হাতছানি।

কোম্পানির দপ্তর যত বাড়ছিল ততই নতুন কর্মচারীর প্রয়োজনও পড়ছিল। শহরে ছিল নতুন সামাজিক মর্যাদার স্বাদ, যা বর্ণ বা বৃত্তিগত ততটা নয়, যতটা বিত্তগত। মুদ্রা-প্রধান অর্থনীতি মধ্যযুগের বংশ-প্রধান দুর্ভেদ্য শ্রেণি-প্রাচীর ভেঙে টুকরো

করে দিয়েছিল। টাকাই হয়ে উঠেছিল নতুন নাগরিক মর্যাদার অনিবার্য এবং একমাত্র মাপকাঠি। সেই সময়ের কলকাতা 'মুদ্রা-রূপ অপেয় অগাধ জলে পরিপূরিতা'[৫১] হয়ে উঠেছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। ইস্ট ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে উঠছিল এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে দেশে তখন আর্থিক সমৃদ্ধির একটা ঢেউ উঠছিল। প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ) বলছেন :

> 'বাঙালি বেনিয়ান এদেশে ইংরেজের পণ্যদ্রব্য প্রচলিত করিয়া ও ইংরেজের বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য কাঁচামাল যোগাইয়া তাহাদের বিপুল লাভের কিছু কিছু অংশ পাইতেছিল। এই অপ্রত্যাশিত ধনাগমের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া এই বৈদেশিক-প্রসাদপুষ্ট ব্যক্তিগুলি এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায় গঠন লইয়া, কেহ বা ইংরাজের রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ইংরাজের সৌভাগ্যলক্ষ্মী যে স্বর্ণপদ্মের উপর আসীনা হইয়াছিলেন, তাহার দুই-একটা পাপড়ি নিজ ধনভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেছিল...মহানগরী সমুদ্রগর্ভোত্থিতা ঐশ্বর্যদেবীর ন্যায় আকাশস্পর্শী অট্টালিকাশ্রেণীতে নিজ সমৃদ্ধির দীপ্তি প্রতিফলিত করিয়া জন্মলাভ করিল।'[৫২]

সামন্ততন্ত্র ও বণিক-তন্ত্রের মিলনের ফলে জন-জোয়ারের স্রোত কলকাতাকে ভরিয়ে ফেলছিল। অষ্টাদশ শতকে অর্থের আকর্ষণেই কলকাতায় এসেছিলেন পঞ্চানন ঠাকুর, গোবিন্দরাম মিত্র, নবকৃষ্ণ দেব, রামদুলাল দে প্রমুখেরা। ইংরেজের সংস্পর্শে এসে যাঁরা রাতারাতি বড়লোক হয়েছিলেন তাঁদের প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল বাবু সমাজ। বংশগরিমা নয়, ধনের অভিমান ও অহংবোধের ওপরেই এই সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই ধনাগমে প্রধান সহায় ছিল ইংরেজরাঅর্থ উপার্জনের অভাবিত সুযোগের সঙ্গে সেকালে ছিল বংশানুক্রমিক উন্নতির প্রতিশ্রুতি :

> 'সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানী বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগরে আধুনিক বাবুদিগের পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া...বেতনোপভুক হইয়া কিংবা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মাঠের ইটের সরদারী চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা...কোম্পানীর কাগজ কিংবা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।'[৫৩]

কলকাতাবাসীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির হার দেখে অন্য জায়গা থেকেও দলে দলে লোকজন কলকাতায় বসতি করতে লাগল। ফলে যে কলকাতা একদিন 'ভয়াবহ ব্যাঘ্র নক্রাদির সজল জঙ্গলময় বসতীস্থলী ছিল'[৫৪] সেই কলকাতাই মাটির গন্ধ মুছে ফেলে দ্রুত নিজের স্বরূপ বদলে ফেলতে শুরু করল। তার প্রাসাদ নগরী হয়ে ওঠার সূত্রপাত হল। পরবর্তী কালে শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে (নভেম্বর ১৮২২) সেটাই জানিয়েছেন :

> 'অপূর্ব ও বিচিত্র শহর কলকাতায় এসে পৌঁছলাম। কলকাতাকে সকলে প্রাসাদপুরী (City of Palaces) বলেন। এ নাম সত্যিই তার প্রাপ্য।'[৫৫]

তবে নগর কলকাতার উন্নতি কোনোদিনই খুব নির্বিঘ্ন ছিল না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে একবার কলকাতার অত্যন্ত দুর্গতি হয়েছিল। ঝড় এবং ভূমিকম্প শহরকে করে ফেলেছিল বিধ্বস্ত আর শ্রীহীন। ১৭৩৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এক বিধ্বংসী ঝড়ে কলকাতা তছনছ হয়ে গিয়েছিল। সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য স্যার ফ্রান্সিস রাসেলের চিঠিতে সেই ভয়াবহ ঝড়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। 'কলিকাতা কল্পলতা' থেকে জানা যাচ্ছে ওই ঝড়ের তাণ্ডব এবং ক্ষয়ক্ষতির কথা :

> 'দুই শত বাটী বিধ্বংস হয় ও কলিকাতাস্থ গীর্জার শোভনতম চূড়া ভগ্ন না হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। জাহাজ সুলুপ ও বোট প্রভৃতিতে লইয়া অন্যূন বিংশতি সহস্র তরণী গঙ্গামগ্ন অথবা ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভাগীরথীতে ৯ খানা জাহাজের মধ্যে ৮ খানা জাহাজ আরোহীগণ সমেত বিনাশ পায়। দ্বি-সহস্র মণ ভারবাহী তরণী সমূহ নদী হইতে এক ক্রোশ অন্তরে বৃক্ষাদির উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।...ভাগীরথীর জল স্বাভাবিক অপেক্ষা ৪০ হস্ত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল।'[৫৬]

এর পরেই বর্গির হাঙ্গামার ভয়ে কলকাতাবাসী বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এই আক্রমণের ভয়ে বহু মানুষ কলকাতায় চলে এসেছিল হুগলীর পশ্চিম তীর থেকে। এর ফলে কলকাতার জনসংখ্যাও এক লাফে অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। এই সময়েই অনেকে কলকাতায় এসেছিলেন যাঁদের উত্তরপুরুষ পরবর্তী ক্ষেত্রে কলকাতার প্রখ্যাত ধনী-রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। যেমন রামদুলাল দে। তাঁর পিতা বর্গি হাঙ্গামার ভয়ে কলকাতায় এসে পড়েছিলেন। মারাঠি শব্দ 'বর্গির' অর্থে অশ্বারোহী। ওই শব্দটি বিকৃত হয়েই বর্গিতে পরিণত হয়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ) বঙ্গীয় শব্দকোষে জানাচ্ছেন মারাঠি বর্গা অর্থ লুঠারু। সম্ভবত সেই থেকে বর্গি। বর্গি বলতে বোঝানো হত একদল অশ্বারোহী মারাঠাকে, যারা সশস্ত্র হয়ে পশ্চিম ভারত থেকে এসে

সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে যথেষ্ট লুণ্ঠন চালাত। মারাঠা নায়ক শিবাজীর মৃত্যুর পর বড় বড় সেনাপতিরা মেতে উঠেছিলেন আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বার্থসিদ্ধির পারস্পরিক দ্বন্দ্বে। বিশেষত ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বাধীন বর্গিরা বাংলায় মৃত্যুর মহোৎসব শুরু করেছিল, তারা বালেশ্বর থেকে রাজমহল অবধি ধ্বংস করতে করতে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেছিল। মানুষের মনে নেমে এসেছিল আতঙ্কের অন্ধকার। গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রা পুরাণ' এ এই নির্মম আক্রমণের ছবি ধরা আছে :

'তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল।।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা পলাএ কত হড়পি লইয়া।।'[৫৭]

তখন বাংলায় ক্ষমতা আলিবর্দি খাঁর (১৬৭৬-১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ) হাতে। কোম্পানি নিজেদের বিপদ বুঝে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দিকে মন দিল। মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রয়াসে কলকাতার তৎকালীন সীমানা ধরে একটি খাল খননের পরিকল্পনা করা হল। পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি হওয়ার কথা ছিল বিয়াল্লিশ গজ চওড়া ও সাত মাইল লম্বা। এটিই 'মারাঠা ডিচ' নামে খ্যাত। কিন্তু ছয়মাস কাজ চলার পর আলিবর্দির কৌশলে বর্গির হাঙ্গামা থিতিয়ে এলো। তখন তিন মাইল খাদ খোঁড়া হয়েছিল। এর পর খাদ আর এগোল না। অনেকদিন পরে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ওই মরা খাদের ওপর দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছিল। সার্কুলার রোড নির্মাণের প্রয়োজনে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ওই খাদ বুজিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন।

যাই হোক, আঠেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলায় অভাবিত রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সূচনা হয়। বণিকের মানদণ্ড ক্রমে শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত হবে এমন ইঙ্গিত এই পর্বের ইতিহাসে মেলে। আঠারো শতকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংকটের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ এদেশে এলাকা দখলে মত্ত হয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক প্রসারণের সঙ্গে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক প্রসারণও জড়িয়ে ছিল। গ্যালাঘার ও রবিনসন (১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ) এক সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে ধারাবাহিকতা চিহ্নিত করে বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ নীতি হল :

'যদি সম্ভব হয়, তবে রীতি বর্জিত পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে
ব্যবসা কর; কিন্তু প্রয়োজনে ব্যবসার খাতিরে শাসন কর।'[৫৮]

ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে বাংলার সুবাদারদের অসদ্ভাব চলছিল নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকেই। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লির সিংহাসন ঘিরে যখন প্রবল সংঘাত, চারপাশে যখন মাৎস্যন্যায়ের পরিস্থিতি, নামসর্বস্ব বাদশাহরা যখন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র

ও হত্যাকাণ্ডের ক্রীড়নক, তখনও কিন্তু কোম্পানি নিজেদের বাদশাহের কৃপা-প্রার্থী রূপেই পরিচয় দিয়েছিল। যেমন কোম্পানির তরফ থেকে জন রাসেল বাদশাহ জাহান্দার শাহের কাছে উজীর-ই-আজম জুলফিকার খাঁর মারফত যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন (৪ জুলাই, ১৭১২) তার বয়ানটি এর সাক্ষ্য দেবে :

> 'The supplication of John Russell who is as the Minutest Grain of Sand, and whose forehead is the tip of his footstool, who is Absolute Monarch and Prop of the Universe whose Throne may be compared to that of Solomons, and whose Renoun is equall to that of Cyrus, the conqueror of the world, the Hereditary Support of Justice, Eradicating oppression'[৫৯]

ইত্যাদি। কিন্তু এই কৃপা-প্রার্থীর ভাব বেশিদিন থাকেনি। সুযোগ পেতেই ঔপনিবেশিক শক্তি নিজেদের জাত চিনিয়ে দিতে ভুল করেনি। সমালোচক উল্লেখ করেছেন :

> 'কোম্পানির বাণিজ্যিক কাজকর্ম থেকেই জন্ম নেয় এলাকা দখলের ইচ্ছা। আর এদেশের রাজনৈতিক অনৈক্য সেই ইচ্ছাপূরণের সুযোগ এনে দেয়। বাকি থাকে শুধু একটি বিশাল সাম্রাজ্যকে জয় করার সামর্থ্য।'[৬০]

আবেদন নিবেদনের পথ দিয়ে শুরু করে নানা ষড়যন্ত্র রচনা ও শেষে রণাঙ্গনে তারা আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে তারা বঙ্গদেশ অধিকার করে এবং শেষে ভারতভূমির অধীশ্বর হয়ে ওঠে। মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকে আলিবর্দি খাঁর সময়কাল পর্যন্ত ইংরেজরা বাণিজ্যিক বিষয়ে নানা সুবিধা ভোগ করলেও নবাবের সঙ্গে সশস্ত্র বিরোধে জড়িয়ে পড়তে সাহস পায়নি। কিন্তু আলিবর্দির মৃত্যুকালেই পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে যখন নবাব পরিবারেই বিরোধের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে তখন থেকেই কোম্পানি নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আলিবর্দির পরে মসনদে আরোহণ করেন তাঁরই দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌল্লা (১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ)। এতে তাঁর আত্মীয় পরিজনদের যথেষ্ট অসন্তোষ সঞ্চারিত হয়েছিল। সবচেয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন ঘসেটি বেগম, আলিবর্দির জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং সৌকত জঙ্গ, আলিবর্দির মধ্যম কন্যার পুত্র, পূর্নিয়ার শাসনকর্তা। তখন থেকেই একটা চক্রান্তের জাল বিস্তৃত হচ্ছিল।

ইংরেজদের সঙ্গে নবাব সিরাজের সম্পর্ক কোনোদিনই ভালো ছিল না। তিনি নবাব হওয়ার পর প্রচলিত নিয়ম মত ইংরেজরা তাঁকে উপঢৌকনও প্রেরণ করেনি, অভিনন্দনও জানায়নি। এদিকে ঘসেটি বেগমের প্রিয়পাত্র ঢাকার নবাব নেওয়ারিশের

দেওয়ান রাজা রাজবল্লভকে সিরাজ তহবিল তছরুপের দায়ে আটক করলে তার পুত্র কৃষ্ণদাস কলকাতায় পালিয়ে এসে ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করে। সিরাজ অবিলম্বে কৃষ্ণদাসকে প্রত্যর্পণের দাবী জানালে ইংরেজরা তাতে কর্ণপাত করেনি। উপরন্তু নবাবের দূতকে অসম্মান করেছিল। এছাড়াও নানা সামরিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে ইংরেজরা নবাবকে অতিক্রম করতে চাইলে উভয়পক্ষের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটতে থাকে। বিশেষত দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের অজুহাতে ফরাসি ও ইংরেজ দুই পক্ষই বাংলায় দুর্গ সংস্কারের কাজ শুরু করেছিল। নবাবের নির্দেশে ফরাসিরা কাজ বন্ধ করে, কিন্তু ইংরেজরা সেই নির্দেশে কর্ণপাত করেনি। এর ফলে নবাবের মর্যাদাহানি ঘটেছিল। উদ্ধত ইংরেজদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ক্ষুব্ধ সিরাজ ৪ঠা জুন, ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ করেন। সমালোচক জানাচ্ছেন কাশিমবাজার কুঠিয়ালরা নবাবের কাছে এক মুচলেকা-পত্রে স্বাক্ষর করে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করেন। সেই মুচলেকা-পত্রের প্রথম শর্তটি লেখা হয়েছিল এইভাবে যে 'নবাবের দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য কেউ যদি কলকাতায় পালিয়ে আসে, নবাবের আজ্ঞা মাত্রই তাঁকে নবাবের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হল, গত ক-বছরে বাণিজ্যের দস্তকের হিসাব ও তার অপব্যবহারের ফলে নবাবের যে ক্ষতি হয়েছে সেটা পূরণ করতে হবে। তৃতীয় শর্ত হল, পেরিন পয়েন্টের (বাগবাজারের কাছে) দুর্গ প্রাকার ও কেলশাল সাহেবের বাগানের গড়বন্দী ভেঙে ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে হলওয়েলের ক্ষমতা একটু কমাতে হবে।'[৬১] কাশিমবাজার কুঠির ওয়াটস সাহেব এই মুচলেকায় স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু বিষয়টা এখানেই সমাপ্ত হল না। সিরাজের কানে আসতে লাগলো যে ইংরেজরা তাদের প্রতিশ্রুতি মানছে না। এমনিতেই ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের ফরমানে কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার জন্যে যে দস্তক দেওয়া হয়েছিল কোম্পানির কর্মচারীরা তার যথেচ্ছ অপব্যবহার করত। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার করায় সরকার প্রচুর রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হত। বিশেষত কলকাতার গভর্নর ড্রেক সুপরিকল্পিতভাবে নবাবের নানা আদেশ অমান্য করে তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে থাকলে নবাবের মনোভাব অসহিষ্ণু এবং আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এসবের ফলস্বরূপ সিরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং কলকাতা আক্রমণ করেন। তারিখটা ছিল ১৬ই জুন। নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে চার দিন লড়াই চলার পর ২০শে জুন নবাবের সৈন্যদল ফোর্ট উইলিয়ম দখল করল। এই আক্রমণে কলকাতা নগরের এবং ফোর্ট উইলিয়মের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। বিপদ বুঝে তার আগেই দুর্গ ছেড়ে পালিয়েছিলেন গভর্নর ড্রেক। তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন ফলতায়। কেল্লার ভেতর তখন ছিলেন হলওয়েল (১৭১১-১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ) এবং পরাজিত ইংরেজ পক্ষের অল্পসংখ্যক সেনা। কথিত আছে এই সময়েই দুর্গের ভেতরে ঘটেছিল 'অন্ধকূপ হত্যা' (Black Hole

Tragedy)। প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়মের ভেতরে একটি ক্ষুদ্র কারাকক্ষ ছিল। সেটি দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট এবং প্রস্থে ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি। সিরাজ দুর্গ দখলের পর নবাবের কর্মচারীরা সেই ক্ষুদ্র কক্ষে সারারাত ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দী করে রেখেছিল বলে হলওয়েল দাবী করেছিলেন। পরদিন সকালে ১২৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এটিই ইতিহাসে 'অন্ধকূপ হত্যা' বা 'Black Hole Tragedy' নামে পরিচিত। তবে এর সত্যতা নিয়ে চিরকালই সংশয় ছিল। আর পরবর্তীকালে গবেষণায় প্রমাণ হয়ে গেছে যে ওইটুকু পরিসরে অত জনের স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। সুতরাং নবাবের চরিত্র কালিমালিপ্ত করার জন্য হলওয়েল এই কাহিনি রচনা করেছিলেন বলে আগামী দিনে ঐতিহাসিকেরা দাবী করেছেন। যাই হোক, কলকাতা অধিকারের পর আলিবর্দির নামানুসারে সিরাজ কলকাতার নাম রাখেন আলিনগর। তারপর মানিকচাঁদকে কলকাতার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে তিনি মুর্শিদাবাদ ফিরে যান। এদিকে কাশিমবাজার ও কলকাতার পতনের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছলে ইংরেজরা কলকাতা উদ্ধারে তৎপর হয়ে উঠল। কর্নেল ক্লাইভ (১৭২৫-১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ) ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের (১৭১৪/১৬-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) নেতৃত্বে একটি নৌবহর কলকাতা উদ্ধারের জন্য যাত্রা করল এবং সহজেই কলকাতা অধিকার করল। তারিখটা ছিল ২রা জানুয়ারি, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ। শেষ পর্যন্ত নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি স্বাক্ষরিত হল ৯ ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ। তার নাম আলিনগরের সন্ধি। এই সন্ধির ফলে ফারুখশিয়রের প্রদত্ত ফরমানের সব শর্তগুলিই বজায় রইল। ইংরেজরা কলকাতায় দুর্গ ও টাঁকশাল বানাবার অধিকার পেল। এছাড়া স্থির হল নবাব কর্তৃক কলকাতা লুণ্ঠনের সময় ইংরেজদের যা ক্ষতি হয়েছে নবাবের পক্ষ থেকে সেই সমস্ত ক্ষতি পূরণ করার ব্যবস্থা করা হবে। এর পরেই আর সময়ের অপচয় না করে ক্লাইভ গোবিন্দপুর গ্রামের জায়গায় নতুন দুর্গ নির্মাণে মন দিলেন।

এদিকে বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে সাময়িক সন্ধি স্বাক্ষরিত হলেও প্রকৃত মিত্রতা স্থাপিত হয়নি। দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে নবাবের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ক্লাইভ চন্দননগরের ফরাসি ঘাঁটি অধিকার করলেন (২৩ মার্চ, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ)। পরাজিত ফরাসিরা তখন মুর্শিদাবাদে আশ্রয় নিলো। এদিকে নবাবের সঙ্গে ফরাসিদের মৈত্রী সম্ভাবনায় আশঙ্কিত ক্লাইভ পথের কাঁটা সরাতে তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি উপলব্ধি করেন ইংরেজদের প্রতি অনুগত কোনও ব্যক্তিকে মুর্শিদাবাদের নবাবের মসনদে না বসালে ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষিত হবে না। কোম্পানির তখনকার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত দুটি। প্রথমত উদ্ধত সিরাজের পরিবর্তে কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষী অথচ দুর্বল-চিত্ত ব্যক্তিকে মসনদ পেতে সহায়তা করা এবং দ্বিতীয়ত বাংলাদেশে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটানো। শেষপর্যন্ত আলিনগরের সন্ধির শর্তভঙ্গ হয়েছে এই অজুহাতে নবাবকে এক চরমপত্র পাঠানো হল এবং তার উত্তর আসার

আগেই ক্লাইভ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন। মনে রাখতে হবে ইতিমধ্যেই জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, মীরজাফর প্রমুখ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ অপরিণামদর্শী সিরাজকে সরানোর জন্য বিশাল চক্রান্ত-জাল বিস্তার করেছিলেন। তাঁদের আহ্বানে সুযোগসন্ধানী ক্লাইভও সেই ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন। স্থির হয় সিরাজ অপসৃত হলে মসনদে বসবেন মীরজাফর এবং এই গোষ্ঠীকে সহায়তা করার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে নানা সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশির প্রান্তরে দুপক্ষে যুদ্ধ হল। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবের সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সিরাজের শোচনীয় পরাজয় ঘটল। এই যুদ্ধের ফলাফল ইংরেজদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনেকখানি সহায়তা করেছিল। এর ফলে প্রথমে বাংলায় এবং পরে সারা ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম হয়ে ওঠে। তারাই হয়ে ওঠে নবাবের সিংহাসনের পশ্চাতে প্রকৃত শক্তি। বাণিজ্যেও তাদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মীরজাফরের নবাবী অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, ওলন্দাজদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে মীরকাশিমকে মসনদে বসানো হয়েছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ এই আট বছরের মধ্যে ইংরেজদের ভাগ্যচক্রের অকল্পনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। মীরকাশিম স্বাধীন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে ইংরেজদের প্রভাবমুক্ত হতে চাইলে সমস্যা আর জটিল হয়ে উঠেছিল। বিনা-শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার নিয়ে দু-পক্ষে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে শুরু হয়েছিল যুদ্ধ। কাটোয়া, গিরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে মীরকাশিম অযোধ্যায় পলায়ন করেছিলেন। সেখানে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা আর দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে এই সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের হাতে পরাস্ত হয় এবং বাংলায় প্রকৃত স্বাধীন নবাবীর অবসান ঘটে। এই যুদ্ধের গুরুত্ব পলাশির থেকে অনেক বেশি কারণ এর ফলে বাংলায় প্রকৃত অর্থে কোম্পানির শাসন শুরু হয়, নবাব তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়, অযোধ্যার নবাব কোম্পানির অনুগত পাত্রে পরিণত হন, নামসর্বস্ব মোগল সম্রাট কোম্পানির বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। এর পরেই ঘটে কোম্পানির দেওয়ানি লাভ। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ই আগস্ট কোম্পানি বাদশাহের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করে। নবাবের হাতে থাকে শুধু ফৌজদারি ও প্রশাসনিক দায়িত্ব। ফলে নবাব পান ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানি পায় দায়িত্বহীন ক্ষমতা। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সে এক পুতুলনাচের ইতিকথা। সব মিলে ইংরেজ কোম্পানি রাজনৈতিক প্রভুত্বের সিংহদ্বারে উপনীত হয়। রণজিৎ গুহ (১৯২২ খ্রিস্টাব্দ) জানাচ্ছেন ভারতে ইংরেজদের উপনিবেশায়ন শুরু হয় ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে। তার আগের সময়টা তাঁর কথায়

'ঔপনিবেশিকতার উদ্যোগ পর্ব'।[৬২] তিনি মনে করেন ওই সময় থেকে ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক 'রাজা-প্রজা'র সম্পর্কে পরিণত হতে থাকে। তার আগে ছিল 'জেতা-বিজেতা' সম্বন্ধ।

এদিকে কলকাতার উত্থানের পথের সমস্ত বাধাই প্রায় দূর করে দিয়েছিল পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ। এর ফলেই মুর্শিদাবাদ তার গুরুত্ব হারাতে শুরু করেছিল। নবাবের আক্রমণের সময়ে অনেক লোক কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র পলায়ন করেছিল, যুদ্ধের ফলে প্রাপ্ত লভ্যাংশে কলকাতার নব কলেবর বা পুনর্গঠন শুরু হলে আবার জনসংখ্যা বেড়ে উঠতে থাকে। এদিকে কলকাতার বাণিজ্যিক আর রাজনৈতিক তৎপরতার বৃদ্ধি কলকাতার নগরায়নের পথকে আরও সুগম করে দিল। যদিও কলকাতার জলবায়ু তেমন সুবিধাজনক ছিল না, মাঝে মাঝেই মহামারী দেখা দিত (যেমন ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে বা ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় মহামারী হয়েছিল), তাছাড়া দুর্ভিক্ষেও মাঝে মাঝেই বিপর্যয় নেমে আসত, তবুও কলকাতা হয়ে উঠতে থাকে আগামীর যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। আসলে বাংলার অতীতের নগরগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচে নগর কলকাতা গড়ে উঠেছিল। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সে প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন :

> 'নবদ্বীপের মতো বিদ্যাস্থান, বা তাম্রলিপ্তির মতো নিছক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে কলকাতা তৈরি হয়নি। ইংরেজ ঔপনিবেশিক ও প্রশাসনিক স্বার্থ নগরায়নের প্রতি ধাপ নির্ধারিত করেছিল।'[৬৩]

W. W. Hunter (১৮৪০-১৯০০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর Our Indian Empire এ বলেছেন :

> 'বাণিজ্যের বিরাট কেন্দ্র অনিবার্য ঐতিহাসিক তাগিদে গড়ে ওঠে, কোন স্বেচ্ছাচারী শাসকের খামখেয়ালে তা গড়ে ওঠে না। এই গড়ে তোলার দায়িত্ব রীতিমতো কঠিন, এত কঠিন যে আমাদের আগে পর্তুগীজ ডাচ ফরাসী সকলেই ভারতবর্ষে এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে, একমাত্র আমরা ইংরেজ-রাজই সর্বপ্রথম সফল হয়েছি। আমাদের আগে এই বিরাট ঐশ্বর্যশালী সাম্রাজ্যের শাসকরূপে যেসব জাতির আবির্ভাব হয়েছে তাদের মতো আমরা আসিনি। আমরা হিন্দুদের মতো মন্দির অথবা মুসলমানদের মতো প্রাসাদ মসজিদ আর কবরখানা নির্মাণের দিকে নজর দিইনি। মারাঠাদের মতো দুর্গ কিংবা পর্তুগীজদের মতো গির্জাও গড়িনি। আমরা এসেছি আধুনিক নগর নির্মাণের জন্য। একাজে আমাদের যোগ্যতা ও প্রতিভা যে অতুলনীয় তা

> আধুনিক শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে আমাদের মহানগর নির্মাণের সাফল্যে প্রমাণিত হয়।’[৬৪]

এদিকে বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ফলে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল এবং রাজস্ব সংগ্রহকারীদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। সে এক চরম অরাজকতার সময়। মহম্মদ রেজা খাঁকে সামনে রেখে কত পদ্ধতিতে রাজস্ব বাড়ানো যায় তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল কোম্পানি। সেকালের রাজস্ব আদায় কেমনভাবে উত্তরোত্তর বেড়ে উঠছিল তার তালিকা দিয়েছেন রায় বাহাদুর প্রমথনাথ মল্লিক (১৮৭৮-১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) :

‘১৭৬১/২ খ্রিঃ ১৩৯৫৯৫৯ পাউন্ড	১৭৬২/৩ খ্রিঃ ১৩০৫৬৫২ পাউন্ড
১৭৬৩/৪ খ্রিঃ ১৩৬৬৪৬৩ পাউন্ড	১৭৬৪/৫ খ্রিঃ ১৮৬১৭২৬ পাউন্ড
১৭৬৫/৬ খ্রিঃ ৩৬৬৬৩৪৭ পাউন্ড	১৭৬৬/৭ খ্রিঃ ৩১৮১৭৬৩ পাউন্ড
১৭৬৭/৮ খ্রিঃ ২৯৯৬৫৩৮ পাউন্ড	১৭৬৮/৯ খ্রিঃ ৩৯৩৩২৫৫ পাউন্ড
১৭৬৯/১৭৭০ খ্রিঃ ৩২৮৭৭০৬ পাউন্ড	১৭৭০/১ খ্রিঃ ২৭৯৭৩০৬পাউন্ড’[৬৫]

তারই মধ্যে কোম্পানির মুনাফা লাভের চেষ্টার অন্ত ছিল না। গভর্নর ভেরেলেস্টের হিসেব অনুযায়ী ‘১৭৬৬, ১৭৬৭, ১৭৬৮ সালে বাংলাদেশ থেকে রফতানি হয়েছিল ৬৩,১১,২৫০ পাউন্ড এবং আমদানি হয়েছিল ৬,২৪,৩৭৫ পাউন্ড দামের জিনিস।’[৬৬] কোম্পানির এই সীমাহীন লাভের আকাঙ্ক্ষা বাংলায় বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। ১৭৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে দেখা দিয়েছিল ভয়ানক দুর্ভিক্ষ যা ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ নামে ইতিহাসে কুখ্যাত। যদিও তাতে কোম্পানির আয় কমেনি। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের জানিয়েছিলেন যে :

> ‘যদিও এই প্রদেশের তিন ভাগের একভাগ লোক মরে গেছে এবং চাষবাসের চরম অবনতি হয়েছে, তাহলেও ১৭৭১ সালের নিট আদায় ১৭৬৮ সালেরও বেশি।’[৬৭]

তবে এরপরেই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটেছিল এবং বিলেতের পার্লামেন্ট কোম্পানির বাণিজ্য ও অধিকারের ওপর কর্তৃত্ব করার জন্য গভর্নর জেনারেল পদের সৃষ্টি করেছিলেন। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সংসদে গৃহীত হয়েছিল রেগুলেটিং অ্যাক্ট। তখন গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি কলকাতা শহরকে নতুন রাজধানী করার পরিকল্পনা করে কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন (নভেম্বর ১৭৭৫) তাতে বলেছিলেন কলকাতা রাজধানী হলে অনেক দিক থেকে সুফল ফলার সম্ভাবনা আছে। কলকাতার জনসংখ্যা বাড়বে, ধনসম্পদ বাড়বে এবং তার ফলে হেস্টিংস এর মতে এই হবে যে :

> 'Which will not only add to the consumption of our most valuable manufacture imported from home but will be the means of conveying to the native a more intimate knowledge of our customs and manners and of conciliating them to our policy and Government.'[৬৮]

বিনয় ঘোষের মতে হেস্টিংস এর এই উক্তির গভীর তাৎপর্য আছে। রেভারেন্ড ফারমিঙ্গার-এর কথাই ঠিক যে 'বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে যদি কলকাতার পত্তন করে থাকেন যোব চার্নক, তাহলে হেস্টিংস 'political capital' হিসেবে কলকাতার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।'[৬৯] সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক দফতর কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল। ইংলিশ আইন অনুযায়ী বিচারব্যবস্থা সাজানো হয়েছিল। কলকাতার গুরুত্ব সবদিক থেকেই ক্রমশ বাড়বে তা অনুভব করতে অসুবিধা হয়নি শাসনকর্তাদের। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে সেখানে স্থাপিত হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। হেস্টিংসের সময় থেকেই কলকাতা রাজনীতির প্রধান কেন্দ্রে অর্থাৎ রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। তখন স্বাভাবিকভাবেই 'অখ্যাত ক্ষুদ্র পল্লীসমষ্টি রাজধানীতে রূপান্তরিত হইয়া রূপের উচ্ছলতায়, লক্ষ লক্ষ নবাগত জনসংঘের সম্মিলিত হৃদস্পন্দনে, বিরাট ঐক্যের সচেতনতায় যেন নব যৌবনের দৃপ্ত শক্তিমত্ততায় চঞ্চল হইয়া'[৭০] উঠেছিল।

দ্বি তী য় প রি চ্ছে দ

নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় গ্রাম-শহরের ভেদ রচনা

হেস্টিংসের সময় থেকেই ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা নতুন করে গড়ে উঠছিল এবং কর্নওয়ালিসের আমলে তা এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। যার ফলে নতুন জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল এবং এই নতুন জমিদার শ্রেণি নগর কলকাতার বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কর্মচারীদের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড অব রেভিনিউ গঠন করে বিভিন্ন স্থানে কালেক্টর নিয়োগ করা হয়েছিল। হেস্টিংস নিলামে পাঁচ বছরের জন্য জমিদার বা ইজারাদারদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত করেছিলেন। এই ব্যবস্থা 'পাঁচসালা বন্দোবস্ত' (১৭৭২-৭৭ খ্রিস্টাব্দ) নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। এই ব্যবস্থায় কিছু অসুবিধা দেখা দিলে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে পাঁচসালার পরিবর্তে 'একসালা বন্দোবস্ত' চালু হয়। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে লাগু হয়

পিট এর ভারত-আইন, যে আইনের বলে কোম্পানির প্রশাসনের ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব ক্রমশ দৃঢ় হয়ে ওঠে। এরপর লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৩৮-১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ) এদেশে আসেন। তিনি ইংল্যান্ডের অনুকরণে ভারতেও জমিদারদের জমির মালিকানা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে জন শোর তাঁর স্মারকলিপি পেশ করে বলেন যে জমির বন্দোবস্ত জমিদারদের সঙ্গেই হওয়া উচিত এবং সরকারী রাজস্ব মোট খাজনার দশভাগের নয়ভাগ হোক। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে জমিদারদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য জমির বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা 'দশসালা বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত। এরপর ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট, রাজস্ব বোর্ডের প্রভাবশালী সদস্য স্যার জন শোর, চার্লস গ্র্যান্ট ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনার পর কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ দশসালা বন্দোবস্তকে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'তে পরিণত করলেন। এতে স্থির হয়েছিল জমিদাররা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের দেয় রাজস্ব সরকারকে প্রদান করে বংশানুক্রমিক ভাবে জমি ভোগ করতে পারবেন। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রাজস্ব মেটাতে ব্যর্থ হলে জমিদারি বিক্রি করে হলেও রাজস্ব মেটাতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে খাজনা দিতে না পারলে জমিদারি হাতছাড়া হয়ে যাবে এমনটাই স্থির হয়েছিল। এটি 'সূর্যাস্ত আইন' হিসেবে পরিচিত হয়েছিল। কোম্পানি ভেবেছিল এর ফলে তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব পাবে। জমির স্থায়ী স্বত্ব পাওয়ায় জমিদাররা কৃষির উন্নতির জন্য জমিতে বিনিয়োগ করবেন, ফলে প্রকৃত অর্থে কোম্পানিই লাভবান হবে। তাছাড়া এর মাধ্যমে দেশে এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠবে যারা তাদের সমর্থক হিসেবে কাজ করবে। আসলে এই বন্দোবস্তের ফলে একটা বড় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল ভূমি ব্যবস্থায়। এর আগে 'মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭২২ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে ১৩ টি চাকলায় বিভক্ত করে সেগুলিকে ২৫ টি জমিদারি ও ১৩ টি জায়গীরে বন্দোবস্ত করেছিলেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক বন্দোবস্তের নাম ছিল 'জমা কামেল তুমারী'। নবাব সুজা খাঁর আমলে মুর্শিদের নির্দিষ্ট রাজস্বের মধ্যে ৪২,৬২৫ টাকা মাত্র বাদ যায় এবং সুজা খাঁ স্বয়ং ১৯ লক্ষ টাকারও বেশি নতুন আবওয়াব ধার্য করে উক্ত বন্দোবস্ত পাকা করেন। এই জমিদারি বন্দোবস্তই পরবর্তী বন্দোবস্তগুলির, এমন কি দশসালা তথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তিস্বরূপ'[৭১] বলে মনে করা হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষে রাজা নিজে ভূমির স্বত্ব ভোগ করতেন না। তাই তাঁর অধীন সামন্তদের আংশিক বা আঞ্চলিক স্বত্ব দেবার অধিকারও তাঁর ছিল না। রাজা দিতেন কেবল রাজস্ব আদায়ের অধিকার, শাসনব্যবস্থা তদারক করার অধিকার। ভারতবর্ষে তাই রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলেও রাজ্য হস্তান্তরিত হত মাত্র, ভূমিস্বত্বের রূপ বদলাত না। বিজয়ী রাজাও শুধু রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ

করতেন। পরবর্তীকালে কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ) এঙ্গেলসকে একটি চিঠিতেও জানিয়েছিলেন :

> '...the basic form of all phenomena in the East ...is to be found in the fact that no private property in land existed. This is the real key, even to the oriental heaven.'[৭২]

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অবস্থার বদল ঘটে গেল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাজনা দিতে না পারায় অনেক প্রাচীন বনেদী জমিদার জমিদারি-চ্যুত হয়েছিলেন। নিলামে জমির মালিকানা স্থির হওয়ায় বহু ভুঁইফোঁড় জমিদারের উৎপত্তি হয়েছিল যাদের সঙ্গে কৃষক ও জমির কোনও সম্পর্ক ছিল না। কেবল অর্থবলে তাঁরা জমিদার হয়ে উঠেছিলেন। অনেক জমিদার আবার অন্যকে জমি বন্দোবস্ত দিতেন। ফলে একাধিক মধ্য-স্বত্বভোগীর উত্থান ঘটেছিল। বিনয় ঘোষ যথার্থই বলছেন :

> 'ইংরেজ আমলে দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার শ্রেণির মৌল রূপান্তর ঘটল এবং নতুন একশ্রেণির জমিদার সৃষ্টি হল। স্থির হল ১১ ভাগের ১০ ভাগ রাজস্ব পাবেন সরকার আর বাকি ১ ভাগ পাবেন জমিদারেরা। সমস্ত অনাবাদী জমিও জমিদারদের দান করে দেওয়া হল। নির্দিষ্ট রাজস্ব যথাসময়ে দেওয়া ছাড়া সরকারের সঙ্গে জমিদারদের আর কোনও সম্পর্ক রইল না। প্রজার মঙ্গল ও আবাদের দায়িত্ব (উন্নতির দায়িত্ব) জমিদারের, একথা কর্নওয়ালিসের বন্দোবস্তের মধ্যে থাকলেও তা শুধু কাগজপত্রেই রইল। আসলে জমিদারেরা ইংরেজের আমলে গোত্রান্তরিত হলেন। তাঁরা আগে ছিলেন রাজস্ব আদায়কারী, জমিজমার উপর কোনও ব্যক্তিগত মালিকানা তাঁদের ছিল না। এখন তাঁরা হলেন জমির মালিক, সরকারের দেয় রাজস্ব দেওয়া ভিন্ন তাঁদের আর কোনও দায়িত্ব রইল না। জমিদারী তাঁদের মূলধনে পরিণত হল।''[৭৩]

রাজস্ব আদায়কারীর সংক্ষিপ্ত ভূমিকা থেকে রাজস্ব-ভোগীর প্রধান চরিত্রে রূপান্তর ঘটছিল জমিদার শ্রেণির। কার্ল মার্কস 'Notes on Indian History' গ্রন্থে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> 'Greater part of the province's landholdings fell rapidly into the hands of a few city-capitalists

> who had spare capital and readily invested it in hand.'[৭৪]

পরবর্তীকালে (১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে) লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক লিখেছিলেন :

> 'আমি মানতে বাধ্য যে ব্যাপক গণবিক্ষোভ অথবা গণ বিপ্লব থেকে আত্মরক্ষার বর্মরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দারুণ কার্যকর হয়েছে।...এর বদান্যতায় এমন এক বিপুল সংখ্যক ধনী ভূস্বামী সৃষ্টি হয়েছে যারা ব্রিটিশ শাসনকে টিকিয়ে রাখতে বিশেষ আগ্রহশীল; সাধারণ জনমানবের উপর তাদের প্রভুত্বও অখণ্ড।'[৭৫]

কিন্তু এই বন্দোবস্ত হয়েছিল সরকারের সঙ্গে জমিদারের, এতে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার তেমন কোনও ব্যবস্থা ছিল না। আগে দেশীয় প্রথা অনুসারে খোদকস্ত প্রজাদের বংশানুক্রমে চাষবাসের ভূমির ওপর যে অধিকার ছিল তা নতুন ব্যবস্থার ফলে আর রইল না, জমিদাররা প্রজাদের উচ্ছেদ করার ও খাজনা বৃদ্ধির পূর্ণ অধিকার পেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) জানাচ্ছেন :

> 'লর্ড কর্নওয়ালিস মহাভ্রমে পতিত হইয়া প্রজাদিগের...গুরুতর সর্বনাশ করিলেন।...রাজস্বের কন্ট্রাক্টরদিগকে ভূস্বামী করিলেন। তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা যে প্রজাপীড়ক সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একেবারে লোপ হইল।'[৭৬]

একথা মেনে নিতেই হবে যে মজুর শ্রেণি ইংরেজ প্রবর্তিত জমিদারি ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিণাম। ভিটেমাটি থেকে খাজনা বা রাজস্বের দায়ে উৎখাত হয়ে বাংলার নির্যাতিত কৃষকশ্রেণি পরিণত হয়েছিল মজুরে। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা প্রবর্তিত হওয়ায় মধ্য-স্বত্বভোগীর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় এক একটি জেলায় ৫০ জন পর্যন্ত মধ্য-স্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়েছিল। ব্যক্তিগত ভূমি-স্বত্বভোগী নতুন যে জমিদারদের উত্থান ঘটেছিল, শুধু রাজস্ব দিয়েই তাদের দায় মিটে যাওয়ায় তাদের ধনসম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছিল এবং মাটির সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তারা 'অ্যাবসেন্টি জমিদার' হয়ে নিশ্চিন্তে বিলাসে সময় কাটাতে লাগলেন নগর কলকাতার বুকে। পরবর্তী কালে হুতোমের নকশায় হুতোম (১৮৪০-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) এরকম কিছু জমিদারকে ব্যঙ্গের চাবুক মেরে লিখেছিলেন :

> 'পাড়াগেঁয়ে দুই একজন জমিদার প্রায় বারো মাস এখানেই কাটান।...দেখলেই চেনা যায় যে ইনি একজন বনগাঁর শেয়াল

রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ---বিদ্যায় মূর্তিমান মা! বিসর্জন, বারোইয়ারি, খ্যামটা নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত...।'[৭৭]

কোনও সন্দেহ নেই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অর্থের অভ্রভেদী প্রাচীরে চিরকালের মত গ্রাম আর শহরের ব্যবধান রচেছিল। গ্রামের শ্রী হরণ করে লক্ষ্মীদেবী শহর-বাসিনী হয়েছিলেন। গ্রাম আর শহরের এই ব্যবধান আর কখনো ঘোচেনি। একদিকে দৈন্যের তীব্র প্রকোপে ধুঁকছিল বাংলার গ্রামগুলি, অন্যদিকে তার প্রাণরস শোষণ করে ফুলে ফেঁপে উঠছিল নতুন নগর। সেখানেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল যাবতীয় সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের পসরা। গ্রাম আর শহরের এই ব্যবধান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) যথার্থই বলেছিলেন :

'এক জায়গায় একদল মানুষ অন্ন উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় একদল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণধারণ করে...একদিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে---অন্যদিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান ভোগবিলাস-সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত...অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রীভূত, স্বভাবতই সেখানে আরাম আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিত...অবস্থার এই কৃত্রিমতায় অন্ন ও ধনের পথে মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটেছে।'[৭৮]

সবচেয়ে বড় কথা এ বিচ্ছেদের পটভূমি অনেকখানি বিস্তৃত। এই বিচ্ছেদ শুধু স্থানিক নয়, কালিকও বটে। নতুন কালের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে বিকশিত হয়ে ওঠা নতুন নগরের পাশে তাই স্তিমিত হয়ে আসছিল অতীতের নগরের গৌরবের দীপশিখাটি। তাই শুধু গ্রামের সঙ্গে শহরের নয়, এ বিচ্ছেদ আদি নগরগুলির সঙ্গে আধুনিক নগরেরও বটে। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, নবদ্বীপ এসব প্রাচীন নগরের 'শুকনো দিন, রস ফুরিয়ে যাওয়া রাত্রি'[৭৯]র পাশে আধুনিক নগর কলকাতার গৌরবময় উত্থান। সেখানে উৎসব, আনন্দ, আতশবাজির ফোয়ারা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঔদ্ধত্যের প্রকাশে নতুন যুগের পদধ্বনি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উনিশ শতক ও প্রথম প্রজন্মের নাগরিক

কলকাতার এই উজ্জ্বল উত্থান যেহেতু গ্রামের শ্রী শোষণ করে নিয়েছিল, ফলে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় একটা ভাঙনের সূত্রপাত হয়েছিল। এতকালের জীবন-জীবিকা প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়েছিল। কলকাতার বাতাসের ঐশ্বর্যের স্বাদ নিতে শুধু যে ধনী জমিদার শ্রেণির মানুষেরা শহরবাসী হয়েছিলেন তাই নয়, বেঁচে থাকার ঐকান্তিক তাগিদে জীবিকাহীন ছিন্নমূল মানুষরাও এসে পড়েছিল শহরে। তৎকালীন অভিজাতবর্গ ও নিম্নবর্গ অর্থাৎ হঠাৎ-ধনী ও দিন-আনা-দিন-খাওয়া মেহনতি মানুষ সকলে মিলেই কলকাতার দখল নিয়েছিল। সেই অভিবাসীরাই ছিল কলকাতার আদিপর্বের তথাকথিত ভদ্রলোক এবং অপর। সেই পর্বের কলকাতার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত সন্ধান করলে বোঝা যায় উভয় শ্রেণির মধ্যে বিত্তগত ব্যবধান থাকলেও অন্যান্য বিষয়ে যেমন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংহতির ক্ষেত্রে তেমন কোনও বিচ্ছিন্নতার আবহ ছিল না। বরং তখন কলকাতা নগর বিচ্ছিন্ন ছিল অন্যভাবে। শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গের বিভাজন রেখায়। কলকাতার নগরায়নের ক্ষেত্রে এই বিষয়টির কথা খেয়াল রাখতেই হবে তা হল নগর হিসেবে গড়ে ওঠার সূচনালগ্ন থেকেই কলকাতাকে বিভক্ত করা হয়েছিল বৈষম্যের দাগে। 'সাদা' আর 'কালো'তে। সমালোচক জানাচ্ছেন :

> 'প্রথম দিকে কলকাতা শহরের রূপটানে প্রভাব পড়েছিল সেই ইংরেজ শাসকবর্গের চিন্তা ভাবনার যারা প্রাক-নাগরিক সংস্কৃতির প্রতিনিধি। কলকাতাকে তারা ঔপনিবেশিক ধাঁচে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তাই কলকাতার মেরুকরণ করা হয়েছিল জাতি বৈষম্যের ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। গোবিন্দপুর, কলকাতা ও সুতানুটি নিয়ে কলকাতা ক্রমশ একীভূত হলেও ইংরেজরা কলকাতাকে ভাগ করেছিল শহরের শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় বাসিন্দা অধ্যুষিত এলাকাকে যথাক্রমে 'হোয়াইট টাউন' ও 'ব্ল্যাক টাউন' নাম দিয়ে।'[৮০]

হোয়াইট টাউন ছিল বাহারের শহর। সৌন্দর্য, রুচি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পীঠস্থান। ইংরেজরা তাকে সাজিয়ে নিয়েছিল মনের মত করে। সেখানে প্রশাসনিক দফতর থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট, বিনোদনের জন্য প্লে হাউস সবকিছুরই জমকালো উপস্থিতি। কিন্তু ব্ল্যাক টাউনের অবস্থান ছিল একেবারেই বিপরীত। কলকাতার সাহেবপাড়ার জৌলুসের সঙ্গে দিশি পাড়ার বৈপরীত্য ছিল চোখে পড়ার মতো। সেই সময়ের অনেক পর্যটকের লেখায়

তার ছবি ধরা আছে। যেমন ইংরেজ পর্যটক ভাইকাউন্ট ভ্যালেন্সিয়া (১৭৭০-১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ) ভারতবর্ষে অবস্থান কালে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিলেন কলকাতায়। তিনি এই বৈপরীত্য বিষয়ে আলোকপাতও করেছিলেন। তাঁর মতে :

> 'The Black Town is a complete contrast to this, as can well be conceived. Its streets are narrow and dirty; the houses of two stories, occasionally brick, but generally weed and thatched perfectly resembling the cabin of the poorest classes in Ireland.'[৮১]

আবার উইলিয়ম হাগিন্স কলকাতার জৌলুস ও চাকচিক্যের বিবরণের পাশাপাশি দিশি পাড়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

> 'Take it, all in all, perhaps no city in the world deserves to be called a mass of misery and magnificence more justly.'[৮২]

এসব লেখা থেকেই বোঝা যায় একটি কলকাতা শহরের মধ্যে ছিল আর একটি কলকাতা শহরের অস্তিত্ব। এই ব্ল্যাক টাউনের মধ্যে আবার নানা আঞ্চলিক বিভাজন ছিল। যেমন কুমোরটুলি, কলুটোলা, আহিরিটোলা, পটুয়াটোলা ইত্যাদি। ব্ল্যাক টাউনে অজস্র মানুষ ছিল, কিন্তু ছিল না পরিচ্ছন্নতার বোধ। তাই রোগের প্রবণতাও ছিল বেশি। শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করেছেন :

> 'পচা দুর্গন্ধময় জলপূর্ণ পুষ্করিণীতে কলিকাতা পরিপূর্ণ ছিল।...এই পুষ্করিণীগুলি জ্বরের উৎসস্বরূপ ছিল...ফুটপাতের পরিবর্তে প্রত্যেক রাজপথের পার্শ্বে এক একটি সুবিস্তীর্ণ নর্দ্দামা ছিল।...এই সকল নর্দ্দামা হইতে যে দুর্গন্ধ উঠিত তাহাকে বর্ধিত ও ঘনীভূত করিবার জন্যই যেন প্রতি গৃহেই পথের পার্শ্বে এক একটি শৌচাগার ছিল। তাহাদের অনেকের মুখ দিনরাত্রি অনাবৃত থাকিত। নাসারন্ধ্র উত্তমরূপে বস্ত্র দ্বারা আবৃত না করিয়া সেই সকল পথ দিয়া চলিতে পারা যাইত না।'[৮৩]

পরিকল্পনাহীন রাশি রাশি বাড়ি, অজস্র সরু সরু গলি রাস্তা, অগুনতি ডোবা, কাঁচা খোলা নর্দমা---সব মিলে সে এক বীভৎস নরককুণ্ড। শহরের স্বাস্থ্য এবং নীতি দুইই তখন ছিল বিপর্যস্ত। তখন প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার, জাল জোচ্চুরি ইত্যাদির দ্বারা ধনী হওয়াও তেমন কিছু লজ্জার বিষয় ছিল না। সমালোচক বলছেন :

> 'নবাবী আমলের শেষ দিকে যে সব বিত্তবান সুখের পায়রারা উড়ি উড়ি করেও আভিজাত্যের খোলা আকাশে গা ছড়াতে পারছিলেন না ইংরেজ আমল সূচনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাখা গজাল। সম্ভ্রান্ত সমাজ পরমেশ্বরের মত এক হতে বহু হয়ে দাঁড়াল। ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট ব্রিটিশ রাজশক্তির ছত্রছায়ায় ব্যাঙের ছাতার মত দিনের পর দিন নব নব কলেবরে প্রকাশিত হতে লাগল---দেওয়ান, গোমস্তা, দালাল, মুচ্ছুদ্দি, জমিদার, তালুকদার।'[৮৪]

পরবর্তীকালে হুতোম তৎকালীন কলকাতা সম্বন্ধে যথার্থই বলেছিলেন :

> 'আজব সহর কলকেতা
> রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
> হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা;
> যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির ফাঁদ পাতা।''[৮৫]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কোম্পানির শাসন-কেন্দ্র, বন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে কলকাতার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও অর্থোপার্জনের ব্যাপক সুযোগ চারিদিকের গ্রামাঞ্চলের মানুষকে প্রচণ্ড ভাবে আকর্ষণ করেছিল। গ্রাম ছেড়ে আসা নানা পেশার মানুষ এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। কলকাতার নাগরিক পরিবেশে আরোপিত হয়েছিল মধ্যযুগীয় গ্রাম সমাজের কাঠামো। তবে হোয়াইট আর ব্ল্যাক টাউনের মধ্যে গঠন আর পরিকল্পনাগত পার্থক্য থাকলেও সামাজিক অনুষ্ঠানে মেলামেশায় কোনও বাধা ছিল না। আর ব্ল্যাক টাউন কিন্তু নামে ব্ল্যাক হলেও মোটেই অন্ধকার ছিল না। সেখানেও ঝাড়বাতির উজ্জ্বল আলো ঝলসে উঠত। কারণ কলকাতার এই অঞ্চলেই থাকতেন দেশীয় ধনীরা। বুলবুলির লড়াই থেকে বেড়ালের বিয়ে জাতীয় নানা আমোদ প্রমোদে ব্যয় হত লক্ষাধিক টাকা। ব্ল্যাক টাউনে ধনীরা 'পিতামাতার শ্রাদ্ধে, পুত্র-কন্যার বিবাহে, পূজা-পার্বণে প্রভূত ধন ব্যয় করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন।...যে ধনী পূজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের খানা দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাঁহার তত প্রশংসা হইত। ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্য ভারতবর্ষ হইতে এক শ্রেণীর গায়িকা ও নর্ত্তকী সহরে আসিত, তাহারা বাঈজী এই সম্ভ্রান্ত নামে উক্ত হইত। নিজ ভবনে বাঈজীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল।'[৮৬] আর এই পর্বে সহসা ধনী হয়ে ওঠা কলকাতার বাবুরা চূড়ান্ত ভোগসুখে দিনযাপন করত।

তাদের সাজসজ্জা আর জীবনযাপনের অসামান্য সব চিত্র আছে সমকালের রচনায়। সেই বাবুদের সাজসজ্জার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

> 'মুখে, ভ্রূ পার্শ্বে ও নেত্রকোলে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগলস সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া...রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত।'[৮৭]

নিখিল সুর জানাচ্ছেন তখন 'কলকাতার ধনীদের হাতে যে সম্পদ ছিল তা সমগ্র বাংলার সম্পদের থেকে বেশি।'[৮৮] কলকাতা নগরীর শৈশবে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বোধ তেমন ছিল না। বড় বড় ধনী মানী বাবুরা নানাবিধ কাজকর্মে ইংরেজদের সান্নিধ্য লাভ করতেন এবং দোলদুর্গোৎসবে নিজেদের গৃহে খানাপিনা বা নৃত্যগীতের আসরে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করতেন। পার্সিভাল স্পিয়ার বলেছেন 'There was no 'European Third' in the 18th century'[৮৯]---অর্থাৎ ইংরেজরা তখন এ-দেশবাসীর সঙ্গে মিলে মিশেই থাকতেন, নিজেদের স্বতন্ত্র তৃতীয় একটি শাসকশ্রেণি মনে করে দূরে সরে থাকতেন না। এদেশীয় মানসিকতার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল তাঁদের ওপরে। তাঁরা এদেশের বাঈজীনাচ, কবির লড়াই, দুর্গোৎসব থেকে হুঁকো গড়গড়ায় তামাকু সেবন পর্যন্ত সবেরই রসাস্বাদন করতেন। উভয়ের মধ্যে ভালই মেলামেশা ছিল। সেই মেলামেশায় গড়ে উঠছিল স্বতন্ত্র কলকাতা কালচার। সেই পর্বের ইংরেজদের সম্পর্কে বিনয় ঘোষ বলছেন :

> 'কলকাতার আদিপর্বে ইংরেজরা কেবল বণিক ছিলেন না, অধিকন্তু জমিদারও ছিলেন। কোম্পানির প্রতিনিধিদের মধ্যে 'জমিদার' পদে একজন ইংরেজ কর্মচারী অভিষিক্তও হতেন। এই জমিদার বণিকের মিশ্র মন আঠের শতকের তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত কলকাতা শহরে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করেছে।...তখনকার ইংরেজ শাসকরাও আকৃতিতে যেমন প্রকৃতিতেও তেমনি স্থূল ছিলেন...মানসিক সম্পদ এঁদের এমন কিছু ছিল না যা দান করার যোগ্য। অবশ্য অর্থলোভ ছিল আর অমার্জিত প্রভুত্ব বোধ ছিল এবং এগুলি এদেশের নতুন উপপ্রভুশ্রেণীর মধ্যে কিছুটা সংক্রামিত হয়েছিল।'[৯০]

গোবিন্দরাম মিত্র, নবকৃষ্ণ দেব, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, রামদুলাল দে বা গোকুল ঘোষাল প্রমুখ ভাগ্যান্বেষী ছিলেন ব্ল্যাক টাউনের আদিপর্বের অভিজাত শ্রেণি। ইংরেজ বণিক ও শাসকের সহচর হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের মোহে তাঁরা তখন ব্যাকুল। তাঁদেরই ধনদৌলত ব্যয় হত এসব অনুষ্ঠানে যেখানে সাহেবরা উপস্থিত হতেন আগ্রহ নিয়ে। ফ্যানি পার্কসের ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাঁর বাঈজীনাচ দেখার অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে। তিনি লিখেছেন :

> 'তারা নাচছিল দল বেঁধে বৃত্তাকারে, পায়ের নূপুরের ঝুম-ঝুম শব্দের তালে তালে। নাচের সময় মুখের, গ্রীবার ও চোখের ভাবপ্রকাশের তির্যক ভঙ্গিমা এত মাদকতাপূর্ণ মনে হচ্ছিল যে তা বর্ণনা করতে পারব না।...গানের সুর ও ভঙ্গি সম্পূর্ণ অন্যরকম, আমরা শুনিনি কখনও।...বাইজীদের মধ্যে একজনের নাম নিকী, শুনেছি সারা প্রাচ্যের বাইজীদের মহারানী সে, এবং তার নাচগান শুনতে পাওয়া রীতিমত ভাগ্যের কথা।'[৯১]

সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের গৃহে নানা উপলক্ষে এমন সব জলসার আয়োজন হত। গবেষক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন :

> 'রামমোহন রায় প্রভৃতি বাঙালি ধনী পৃষ্ঠপোষকদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত ইউরোপীয় শ্রোতারা 'নিকি'র কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তখনকার ইতালীয় অপেরা-গায়িকা Angelica Catalani (১৭৮০-১৮৪৯) ও জর্মান গায়িকা Elizabeth Billington (১৭৬৮-১৮১৮) এর তুলনা করতেন। এই দুই ইউরোপীয় sopranoর মতো 'নিকি'র গলা খেলত উচ্চ সপ্তকে।'[৯২]

শর্মিষ্ঠা দে তাঁর 'Marginal Europeans' গ্রন্থেও দেখিয়েছেন ভারতে আগত ইউরোপীয় বা ইংরেজরা সকলে এক ধাঁচের ছিল না। শাসক জাতির মধ্যেও ছিল স্তর ভেদ। কোম্পানির অনেক ইংরেজ কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে ভারতীয় সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন করে নিয়েছিলেন। শাসকজাতি হিসেবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার প্রয়াস ও সচেতনতা দেখা যায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ব্রিটিশ রাজের আমলে, দু একটা ব্যতিক্রম ছাড়া। তিনি লিখছেন :

> 'The superiority complex and racial feeling were not there...because of this common interest in mixing and the need to respect each other.'[৯৩]

লর্ড কর্নওয়ালিসের (১৭৩৮-১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ) আমল থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং উনিশ শতকের অভ্যুদয়ে লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৬০-১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ) আসেন

উদ্ধত 'ইম্পিরিয়াল' মেজাজ মর্জি নিয়ে। তিনি ছিলেন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী। মূলত তখন থেকেই শাসক ও শাসিতের ব্যবধান বেড়ে উঠতে থাকে। সম্পর্ক হয়ে উঠতে থাকে রাজা-প্রজার, প্রভু-ভৃত্যের। এই দূরত্ব দেখে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এসে শ্রীমতী গ্রাহাম লিখেছিলেন :

> 'The distance kept up between the Europeans and the natives..is such that I have not been able to get acquainted with any native family..Every Briton appears to pride himself on being outrageously a John Bull.'[৯৪]

তবে লর্ড ওয়েলেসলি সাম্রাজ্যবাদী শাসক হলেও তাঁর আমল থেকেই কলকাতা তার মধ্য যুগের উত্তরাধিকার ঝেড়ে ফেলে আধুনিক শহরের রূপ নিতে শুরু করে। লর্ড ওয়েলেসলিকে আধুনিক কলকাতার জনক বললেও অত্যুক্তি হয় না। নান্দনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আধুনিক কলকাতার রূপরেখা টানতে চেয়েছিলেন তিনি। নগরায়নের সুচিন্তিত পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন। অনেকেই ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মিনিটকে কলকাতার নগর পরিকল্পনার ব্লু প্রিন্ট বলে উল্লেখ করেন। নিখিল সুর জানাচ্ছেন ওয়েলেসলির মিনিটে তিনি বলেছিলেন :

> 'কলকাতার প্রসার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের আসন কলকাতার প্রয়োজন সরকারের সুগভীর মনোযোগ। এই মহানগরের বহুসংখ্যক মানুষের স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা প্রণয়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।'[৯৫]

তাঁর মনে হয়েছিল শহরের বাহ্য রূপ ও সৌন্দর্য শহরবাসীর স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে জড়িত। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন :

> 'It is a primary duty of Government to provide for the health, safety and convenience of the inhabitants of this great Town.'[৯৬]

তাছাড়া তিনি নগর উন্নয়নের জন্য ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটসহ ত্রিশ জন সদস্যের একটি নগর উন্নয়ন পরিষদ গঠন করেছিলেন। এদের সহায়তার জন্য আরও কিছু উপকমিটি গড়ে তোলা হয়েছিল। কলকাতার সৌন্দর্যায়নের জন্য কিছু প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। ওয়েলেসলি সরকারি ব্যয়ে উন্নয়ন করতেও প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু পরিচালক সমিতির বক্তব্য ছিল শহরবাসীর অর্থে উন্নয়নের কাজ করতে হবে। তার ফলে কাজের গতি যথেষ্ট মন্থর হয়ে পড়েছিল, সমস্ত সুপারিশ বাস্তবায়িত করা

সম্ভবও হয়নি। তবু তাঁর নগর পরিকল্পনার এসব সূত্র আগামীর কাজে সহায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই। লটারির টাকায় শহরের উন্নয়ন, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য, নিকাশি ব্যবস্থা, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি পরিকল্পনা উনিশ শতকেই গৃহীত এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এসবই ছিল নগরায়নের অনিবার্য শর্ত। তবে বাহ্যিক নাগরিক বিবর্তনের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বিবর্তনের প্রক্রিয়াটাও সমানভাবে বহমান ছিল, তার প্রমাণ দুর্লভ নয়। গোটা অষ্টাদশ শতক জুড়ে একটু একটু করে বদলে যাচ্ছিল কলকাতার জীবন, কলকাতার মন।

চতুর্থ অধ্যায়

‘শিষ্ট ভদ্রলোক’ ও ‘অপর’এর নতুন সংজ্ঞার্থ নির্মাণ

এর পরেই অষ্টাদশ শতাব্দীর সূর্য ডুবল। আবির্ভূত হল উনিশ শতকের আলোক-দীপ্ত প্রহরমালা। মনে রাখতে হবে, কলকাতার নগরজীবন এক নতুন মোড় নেয় উনিশ শতকের সূচনায়। মানুষের চিন্তা ও ভাবজগতে পরিবর্তনের সূচনা হতে থাকে। সংবাদপত্র, ছাপাখানার বিস্তার মানুষের মনকে প্রসারিত করতে শুরু করে। বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির আবির্ভাব হয় এই সময়-পর্বে। ব্রিটিশ কলোনিয়াল আর্থ–সামাজিক পরিস্থিতিতে ভদ্রলোকের স্ট্যাটাস ও চরিত্র বদলে যেতে শুরু করে। আর তাদের প্রভাব বৃদ্ধি হয় ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিকতার প্রসারের ফলে। মনে রাখতে হবে ইংরেজ আমলের গোড়া থেকে কিন্তু আধুনিক শিক্ষার প্রচলন হয়নি, কারণ যতটা শাসকের প্রয়োজনে এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল, সাধারণের স্বার্থের খাতিরে ততটা হয়নি। তাই প্রথম দিকে শাসকশ্রেণি এদেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে কোনও আগ্রহ দেখায়নি, বরং দেশীয় ভাষা শিক্ষার ব্যাপারেই আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্বে হিন্দু-মুসলিম ভারতবাসী পাঠশালা, টোল, মক্তব, মাদ্রাসায় আরবি, ফারসি, সংস্কৃতের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করত। সেই শিক্ষা কিছু প্রাথমিক জ্ঞান ও ধর্মীয় উপাখ্যান সম্পর্কে ধারণা লাভের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের তেমন ধারণাই ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন সেদিন ‘বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সকল পণ্ডিতগণেরও অজ্ঞাত ছিল।’[৯৭] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে স্যার চার্লস গ্রান্ট (১৭৪৬-১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ), উইলবারফোর্স (১৭৫৯-১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রমুখের নেতৃত্বে বিলেতে সংসদে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে সওয়াল করলেও তা তখন তেমন গুরুত্ব পায়নি। আসলে দেওয়ানি কাজের ভার কোম্পানির হাতে আসার পরেও

ফৌজদারি কাজের ভার অনেকদিন মুসলিম কর্মচারীদের ওপরেই ছিল। তখন বিচারে ইংরেজ জজকে সাহায্য করার জন্য এক একজন মৌলবি থাকতেন। কিন্তু আইনজ্ঞ মৌলবি পাওয়া সর্বদা সহজ হত না। এসব ভেবেই বিশেষত হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ) দেশজ ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য নানারকম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। শিক্ষা বিস্তারে হেস্টিংস এর ভূমিকার প্রশংসা করে বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ) লিখেছিলেন যে হেস্টিংসের আগে 'প্রজাদিগকে বিদ্যাদান করিবার কোনও অনুষ্ঠান হয় নাই। প্রজারা অজ্ঞানতা কূপে পতিত থাকিলে, কোনও কালে, রাজ্যভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না; এই নিমিত্ত তাহাদিগকে বিদ্যাদান করা রাজনীতির বিরুদ্ধ বলিয়াই পূর্বে বিবেচিত হইত।'[৯৮] কিন্তু হেস্টিংস প্রজা মঙ্গলের জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস করেছিলেন এবং তাঁর নির্দেশেই দেশীয়দের ইষ্টসাধনে বিদ্যালয় গড়ে উঠছিল। তাঁর সুপারিশে সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ হয়েছিল। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপনের সংকল্প করেছিলেন। সেখানে আরবি ফারসি ভাষায় শিক্ষাদান করা হত। এরপর ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির। স্যার উইলিয়ম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন প্রথম সভাপতি আর হেস্টিংস ছিলেন প্রথম পৃষ্ঠপোষক। এর ফলেই বাংলাদেশে বিশেষত কলকাতায় এশিয়াখন্ডের নানা বিষয় নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। জোন্স ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের প্রথম পথিকৃৎ। তারপর ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলির প্রচেষ্টায় কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। যদিও তার জন্ম হয়েছিল সিভিলিয়ান তৈরির প্রয়োজনে। এদেশের ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ হলে দেশশাসন করা অসুবিধাজনক, তাই বিলেত থেকে আগত সিভিলিয়ানদের এই কলেজে পাঠ গ্রহণ করতে হত। এই কলেজের সূত্র ধরেই বাংলা গদ্য চর্চার একটি নতুন পথ খুলে গিয়েছিল, দেশীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতায় রচিত হয়েছিল নানা গ্রন্থ। ওই কলেজের সাহায্যে যখন পরোক্ষভাবে দেশে বাংলাভাষার চর্চা হচ্ছিল তখন কলকাতার সম্ভ্রান্ত মানুষদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে আগ্রহ ঘনীভূত হচ্ছিল। কয়েকজন ফিরিঙ্গি এই সময়ে কলকাতার বুকে ইংরেজি শিক্ষার স্কুল খুলেছিলেন। যেমন Sherburne, Martin Bowle, Arratoon Petres প্রমুখের স্কুল তখন যথেষ্ট বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। তবে সে সময়ে মূলত ইংরেজি শব্দ ও তার অর্থ শেখানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া হত। যে যত ইংরেজি শব্দ জানত সে তত ইংরেজি-শিক্ষিত হিসেবে প্রতিপন্ন হত। কিন্তু তখনও শাসকের পক্ষ থেকে ইংরেজি শিক্ষাদানের বিষয়ে তেমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ভারতবর্ষে তাদের শাসন আর শোষণের শিকড়টাকে সুদূরপ্রসারী করে তুলতে চেয়ে তারা উৎসাহ জোগাতে চেয়েছিল দেশীয় ভাষা শিক্ষাতেই। ফলে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ খুলে প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার প্রতি সরকার আগ্রহ দেখিয়েছিল। দেশীয় ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র গঠন করে

এই দেশবাসীর আস্থা অর্জনের একটি অভিপ্রায় ইংরেজদের ছিলই। কারণ যুদ্ধ জয়ে অস্ত্রের ভূমিকা অপরিহার্য হলেও বিজিতের ওপর বিজেতার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আরও আনুষঙ্গিক আয়োজনের প্রয়োজন হয়। লর্ড ক্লাইভ (১৭২৫-১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ) যতই অস্ত্রবল, বাহুবলের জোরে ক্ষমতা অধিকার করুন না কেন, পরবর্তী ব্রিটিশ আধিকারিকদের উপযুক্ত পরিকল্পনা ব্যতীত এই অধিকার প্রতিষ্ঠা খুব সহজ ছিল না। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার আয়োজনে শিক্ষা একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অবশ্যই এই প্রচেষ্টা সফল হতো না যদি উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকদের আনুগত্য ও সহযোগিতা অর্জন সম্ভব না হতো। এই আনুগত্যের পথ প্রশস্ত করেছিল ইংরেজি মাধ্যম পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন, তাতে সন্দেহ নেই। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে শাসক আর শাসিতের মধ্যে এক নতুন গ্রন্থিবন্ধন করাই ছিল শাসকের উদ্দেশ্য। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির বাণিজ্যের নতুন সনদে ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বছরে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। সেই টাকা কোন প্রকারের শিক্ষায় ব্যয় হবে তা নিয়ে জল্পনার অন্ত ছিল না। কিন্তু ততদিনে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব অনুভূত হতে শুরু করেছিল সমাজ-মনে। প্রশাসন ইংরেজির অনুকূলে শিক্ষানীতি ঘোষণা করার আগে থেকেই কিন্তু ইংরেজির অনুশীলন শুরু হয়ে গিয়েছিল জীবিকার তাগিদে। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন এর সদস্যরা প্রাচ্য বিদ্যার জন্য অর্থব্যয় শুরু করলে রামমোহন রায় (১৭৭২, মতান্তরে ১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ) লর্ড আমহার্স্টকে (১৭৭৩-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) চিঠি লিখে সরকারী শিক্ষানীতিকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন। নিজে প্রাচ্যবিদ্যায় পণ্ডিত হলেও তাঁর বক্তব্য ছিল ভারতীয়দের শিক্ষাখাতে বরাদ্দ টাকা যেন প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে অপচয় করা না হয়। তাঁর চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল :

> 'If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge of Baconion philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner, the Sanskrit system of education would be best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British Legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a

> more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry, anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talent and learning educated in Europe, and providing a college furnished with necessary books, instruments, and other apparatus.'[৯৯]

সংবাদপত্রেও দাবী উঠতে থাকে যে 'সরকারের কর্তব্য দেশের সর্বত্র এমন উন্নতমানের শিক্ষার বীজ বপন করা যাতে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয় এবং মানুষ প্রশাসন ও অন্যবিধ সরকারী কাযে যোগ্যতা অর্জন করে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি গ্রামেই একটি করে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন।'[১০০] মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকে বাংলাদেশের সমাজে যে নতুন চিন্তার আলোড়ন এসেছিল তার স্নায়ু-কেন্দ্র ছিল কলকাতা। সে যুগের যাবতীয় সামাজিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংস্কারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তদানীন্তন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। সমাজের ও মনের বদ্ধ জানলা ভেদ করে উনিশ শতকেই এসেছিল নতুন আলোর আহ্বান। ইংরেজি ভাষা ও শিক্ষার ওপরে নতুন এক সামাজিক আভিজাত্য আরোপিত হতে শুরু করেছিল। প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার বদলে শুরু হয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের উদ্যোগ। মধ্যবিত্ত বাঙালি, বিশেষ করে হিন্দুরা এই বিদ্যাচর্চার সুযোগ নিয়েছিলেন এবং নতুন সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই নব লব্ধ বিদ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) 'Literature of Bengal' এ জানাচ্ছেন :

> 'The British conquest of Bengal was not merely a political revolution, but brought in a greater revolution in thought and ideas, in religion and social progress. The Hindu intellect came in contact with all that is noblest and most healthy in European history and literature, and profited by it. The Hindu mind was to some extent trained under the influence of European thoughts and ideas, and benefited by it.'[১০১]

মুসলিমরা এই সুযোগ সেভাবে গ্রহণ করেননি। ক্ষমতাচ্যুত মুসলিম সমাজের ইংরেজ বিদ্বেষ ছিল স্বাভাবিক। উভয়পক্ষের এই বিদ্বেষভাব আর অবিশ্বাস তাদের সম্পর্ককে

স্বাভাবিক হতে বাধা দিচ্ছিল। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা ছিল না, ফলে সহজেই তাঁরা নতুন যুগের নতুন শিক্ষার আলোকে গ্রহণ করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে থাকেন। শিবনাথ শাস্ত্রী জানাচ্ছেন :

> 'বৎসরের পর বৎসর যতই ইংরাজ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, যতই ক্রমে শাসনকার্যের জন্য আইন-আদালত প্রভৃতি স্থাপিত হইতে লাগিল, যতই ইংরাজ বণিকগণ দলে দলে আসিয়া কলিকারা সহরে আপনাদের বাণিজ্যাগার স্থাপন করিতে লাগিলেন, ততই এদেশীয়দিগের, এবং বিশেষভাবে কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের মধ্যে, স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হইতে লাগিল।'[১০২]

ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে ডেভিড হেয়ারের (১৭৭৫-১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ) অবদান ছিল অনস্বীকার্য। রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ) বলেছেন :

> 'তাঁহাকে এতদ্দেশীয়দের ইংরেজী শিক্ষার প্রথম সৃষ্টিকর্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন ও হিন্দু কালেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন।'[১০৩]

তখনকার মানুষ কার্যক্ষেত্রে ইংরেজির গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেছিল সেই সময় থেকেই। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :

> 'প্রাতঃস্মরণীয়' ডেভিড হেয়ার তাঁর স্কুলে ভরতি-প্রার্থীদের অনুরোধে উপরোধে উত্যক্ত হইয়া উঠেছিলেন। 'তখন স্বীয় স্বীয় বালকদিগকে ইংরেজী শিখাইবার জন্য লোকের এমন ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল যে, হেয়ারের পক্ষে বাটীর বাহির হওয়া কঠিন হইয়াছিল। বাহির হইলেই দলে দলে বালক "me poor boy, have pity on me, me take in your school" বলিয়া তাঁহার পাল্কীর দুই ধারে ছুটিত।'[১০৪]

নতুন যুগের নতুন শিক্ষার বিস্তারে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'হিন্দু কলেজ' (১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ)। এই সময়ের শিক্ষার আন্দোলন প্রধানত হিন্দু কলেজের মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হয়েছিল। তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ) অনুগামী একদল নব্য যুবক এই তন্দ্রাতুর জাতির নানা কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। তারাই উনিশ শতকের বিখ্যাত 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী। রমেশচন্দ্র দত্তের 'Literature of Bengal' থেকে জানা যাচ্ছে :

> 'The Hindu College, which was established in 1817, effected a revolution in the ideas of the young Hindus of the day. They imbibed in that

> College a warm appreciation of western literature and western civilization, and brooked with impatience the unreasoning restrictions which modern Hindu customs had imposed on them. Trained under teachers like Derozio and D. L.Richardson, the first young men who came out from the Hindu college were fired with ambitions to reform all that was unhealthy, and to reject all that was hurtful in Hindu customs and rules.'[১০৫]

এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রমুখের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। এই শিক্ষায়তন থেকে শিক্ষা লাভ করেই যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠেছিল তৎকালীন নব্য যুবকেরা, যারা আগামী দিনে উজ্জ্বল করেছিল দেশ ও দশের মুখ। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল 'স্কুল বুক সোসাইটি', পরের বছর 'স্কুল সোসাইটি'। শুধু তাই নয়, একের পর এক নানা সভা সমিতির উত্থান ঘটছিল। নানা সংস্কার আন্দোলনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী জানাচ্ছেন :

> '১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতি বর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকল দিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল।'[১০৬]

বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেকলের প্রতিবেদন অনুযায়ী বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতি ঘোষণা পর্যন্ত কালকে বলা যেতে পারে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার যুগ। তৎকালীন বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদের নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই কমবেশি এই প্রক্রিয়ার অংশীদার হয়েছিলেন। ইংরেজি শেখার জন্য জনসাধারণের আগ্রহের কথা নানা সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে। সুশীল কুমার গুপ্ত তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে ট্রিভেল্যানের বক্তব্য তুলে ধরেছেন :

> 'A loud call arose for the means of instruction in it, and the subject was pressed on the Committee from various quarters. English books only were in any demand : upwards of thirty-one thousand English books were sold by the school-book

> society in the course of two years, while the education committee did not dispose of Arabic and Sanskrit volumes enough in three years to pay the expense of keeping them for two months.'[১০৭]

ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি নির্দিষ্ট অবয়ব লাভ করেছিল ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। সমালোচক পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩১-১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ) সেই সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> 'আরবি-ফারসির প্রদীপে তেল এসেছে ফুরিয়ে। সংস্কৃত আর জোগাতে পারছে না যথাযথ আলো, সামাজিক উত্তরণের এই সন্ধিক্ষণের অন্ধকারে। এখন প্রয়োজন ইংরেজি ভাষার সঙ্গে নিবিড় সৌহার্দ। তা নইলে আত্মোন্নয়ন, বিত্ত অর্জন, সামাজিক মর্যাদা অর্জন, আধুনিক বিদ্যা অর্জন, অসম্ভব। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর চাপ থেকেই ১৮৩৫-এ ইংরেজ সরকার বাধ্য হল তাদের নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণায়।'[১০৮]

সেই সময় লর্ড বেন্টিঙ্কের সচিব হয়ে ভারতে এসেছিলেন টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন এর প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। কমিটি তখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রীতিতে শিক্ষাদান সম্পর্কে দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। তাদের যে পক্ষ সংস্কৃতের দিকে তারা Orientalists অর্থাৎ সংস্কৃত-পন্থী, অন্যপক্ষ Anglicists অর্থাৎ ইংরেজি-পন্থী। প্রেসিডেন্ট হিসেবে টমাস ব্যাবিংটন মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকূলে রায় দিয়েছিলেন। তাঁর বাগ্মিতা ও যুক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষা-পন্থীদের জয় এনে দিয়েছিল। তাঁর মতে সাহিত্যের বা বাস্তব উপযোগিতার প্রেক্ষিতে এ দেশের জনসমষ্টির ক্ষেত্রে ইংরেজিই সর্বাধিক উপযুক্ত ভাষা। মেকলে এও বলেছিলেন যে :

> 'We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indian in blood and colour but English in tastes, in opinion, in morals and in intellect.'[১০৯]

অর্থাৎ তাঁদের মূল লক্ষ্য এমন এক শ্রেণির মানুষ সৃষ্টি করা যারা শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করবে, যারা শুধু রক্তে-বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু রুচি, জীবনবোধ, নৈতিকতা, মননের দিক থেকে হবে পুরোপুরি ইংরেজ। আর তাদেরই মাধ্যমে চুঁইয়ে পড়া শিক্ষা সাধারণের কাছে পৌঁছবে। একেই বলা হয় 'ফিলট্রেশন থিওরি'। মেকলের প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক (১৭৭৪-১৮৩৯

খ্রিস্টাব্দ)। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ ঘোষিত হয়েছিল নতুন হুকুমনামা যে এরপর থেকে প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত কোনও গ্রন্থ সরকারি অর্থে ছাপানো হবে না; শিক্ষাখাতে বরাদ্দ টাকার সবটাই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে, ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সম্প্রচারে ব্যয় করা হবে। সমালোচক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ) জানাচ্ছেন :

> 'ইংরেজ আগমনের পর থেকে যত পোক্ত হয়েছে বিদেশি রাজশক্তি, তত বেড়েছে ইংরেজির দাপট ও প্রাধান্য। সে-ভাষা সংস্কৃত-আরবি-ফারসিকে স্থানচ্যুত করে ক্রমে হয়ে ওঠে ক্ষমতার অবলম্বন। যা গোড়ায় ছিল ভাবপ্রকাশের বিকল্প মাধ্যম, তা উন্নীত হয় নির্বিকল্প ক্ষমতা-ভাষার পর্যায়ে। প্রক্রিয়াটিকে চূড়ান্ত পরিণতির প্রান্তে ঠেলে দেন মেকলে।'[১১০]

তিনি যথার্থই অনুমান করেছিলেন যে 'ব্রাউন সাহেব' বানানোর এই পরিকল্পনা সফল হলে আগামী দিনে উপনিবেশের প্রভুরাই লাভবান হবে। একসময় এই 'ব্রাউন সাহেব'দেরই প্রচেষ্টায় উপনিবেশের সাধারণ প্রজারা মেনে নেবে প্রভু-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বকে। এদেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের নতুন পাশ্চাত্য শিক্ষার সংশ্রবে বিশ্ব-বীক্ষার পাঠ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে আসলে তাদের চৈতন্য অধিকারের সচেতন রাজনীতির অঙ্কটি কষতে ঔপনিবেশিক শাসকের ভুল হয়নি। এই সময়েই নির্মিত হচ্ছিল নতুন নাগরিকের সংজ্ঞা। ভদ্রলোক এবং অপরের ধারণাটি বিনির্মিত হচ্ছিল নব্য শিক্ষার মানদণ্ডে। বাঙালি ভদ্রলোক বলতে উনিশ শতকের শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত প্রভাব ও প্রতাপশালী নাগরিকদের বোঝানো হতে লাগলো। আমরা যদি ভদ্রলোকের ইতিহাস খুঁজি তাহলে দেখতে পাব অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সমাজে এই শ্রেণির এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সেই ভদ্রলোক ছিল জাতিগত বা বর্ণগত ভাবে উচ্চকোটিতে বিরাজিত এক শ্রেণি। কিন্তু উনিশ শতকে এসে পাশ্চাত্য প্রভুশক্তির অঙ্গুলিহেলনে নতুন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে সেই ভদ্রলোকের ধারণাটি বিবর্তিত হতে লাগলো। পাশ্চাত্য শিক্ষা আর আলোকপ্রাপ্তির নিরিখে রচিত হল ভদ্রলোকের নতুন সংজ্ঞা আর উনিশের নব জাগৃতির আলোকিত বৃত্তের বাইরে থেকে যাওয়া আপামর জনতা হয়ে উঠল অপর। মানুষে মানুষে ব্যবধান বেড়ে উঠল। শাসকের divide and rule policy এই বৈষম্যকে প্রশ্রয় দিতে লাগলো। কেবল ভূখণ্ড নয়, মন বিভাজনের নীতিতে তারা ছিল দক্ষ। তাই গ্রাম-শহর, সাদা-কালো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নানাবিধ বিভাজনকে তারা বাড়িয়ে তুলতে চাইল নিজেদের সুবিধার্থে।

বিনয় ঘোষ যথার্থই বলেছেন ব্রিটিশের প্রধান লক্ষ্য ছিল নিরাপদ নিশ্চিন্ত শাসনের উদ্দেশ্যে দেশের আইনশৃঙ্খলা ও সামাজিক স্থিতি যে কোনও উপায়ে বজায় রাখা। তাঁরা এমনভাবে সমাজের শ্রেণিবিন্যাসটিকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন যাতে তার

অতীতের সামন্ততান্ত্রিক বনেদটি মূলত বজায় থাকে। গ্রাম্য সমাজে নতুন জমিদার-শ্রেণি, বৃহৎ একটি জমিদারি নির্ভর মধ্য-স্বত্বভোগী ও গ্রাম্য মধ্য-শ্রেণি, নাগরিক সমাজে নতুন অর্বাচীন অভিজাত-ধনিক শ্রেণি, খুদে ব্যবসায়ী, দোকানদার, চাকুরীজীবী প্রভৃতিদের নিয়ে বড় একটি নাগরিক মধ্য-শ্রেণি এবং তার মধ্যে সোনার চাঁদের মতো একদল ইংরেজি শিক্ষিত এলিট। সাম্রাজ্যবাদীর অধীন দেশে, যেমন আমাদের বাংলাদেশে এই শিক্ষিত এলিট গোষ্ঠী সম্পর্কে জ্যঁ পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ) যে উক্তি করেছিলেন তা নির্মম হলেও সত্য :

> 'The European elite undertook to manufacture a native elite. They picked out promising adolescents : they branded them, as with a red-hot iron, with the principles of western culture; they stuffed their mouths full with high sounding phrases, grand glutinous words that stuck to the teeth...These walking lies had nothing left to say to the their brothers;they only echoed' (Preface, Fanon : The Wretched of the Earth).'[১১১]

আসলে ইউরোপিয়ান আদর্শ-পুষ্ট হয়ে এদেশের শিক্ষিত এলিট গড়ে উঠেছিল। সেই আদর্শের বীজ থেকে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর থেকে গাছ ফুল ফল হবার মতো দেশের মানুষের মনের মাটি তৈরি হয়নি। যাবতীয় উন্নতি ও প্রগতি মূলত বর্ধিষ্ণু বুর্জোয়া শ্রেণি আর নতুন মধ্যবিত্তের জন্য নির্ধারিত ছিল। জনতার সঙ্গে তার যোগ ছিল না। ইংরেজ শাসন এবং জাতীয় জীবনে নবজাগরণ সম্পর্কে একদিকে বিশ্বাস-মুগ্ধতা আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষের দুরবস্থা এবং জনজীবন থেকে শিক্ষিত নাগরিক সমাজের বিচ্ছিন্নতার বোধ উনিশ শতকে বাঙালির মধ্যে একই সঙ্গে লক্ষিত হয়। উনিশের নবজাগরণ তাই কিছুটা সীমাবদ্ধ বটেই। তবে প্রথম পর্বে ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণির কর্তাভজা মনোভাব থাকলেও সমাজ বিবর্তনের প্রবাহে তাদের একটি অনবদ্য ভূমিকা ছিল, সেটা অধ্যাপক টয়েনবি (১৮৮৯-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ) ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে যা বলেছেন সেই transformer-এর ভূমিকা। সমালোচক বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলছেন :

> 'একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার যেমন ভিন্ন শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎবাহী যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ গ্রহণ করে, বুদ্ধিজীবীরাও তেমনি এক ভুবন থেকে আহরিত ধ্যানধারণা সাংস্কৃতিক সম্পদ অন্য এক ভুবনে সঞ্চালিত করে। কোনও সমাজে বুদ্ধিজীবীদের অস্তিত্ব থেকে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয় যে, দুটি বিচিত্র প্রকৃতির সভ্যতা অথবা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেয়সের বোধে আশ্রিত

> সংস্কৃতি পারস্পরিক সংঘাত বা সংযোগ-বিয়োগের সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়েছে। উনিশ শতকের ক্রান্তি লগ্নে ওই মানুষেরা ইউরোপীয় প্রেয়োবাদী জীবনবোধের বিদ্যুৎ নিজ নিজ সমাজে সঞ্চালিত করে।'[১১২]

একথা ঠিক যে উনিশ শতকের পরিবর্তনশীল পরিবেশে অবগাহন করে কোনও সংবেদনশীল মানুষের পক্ষেই ইউরোপীয় জীবনাদর্শ ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। তাই প্রারম্ভিক উদ্দীপনার পর্বে ব্রিটিশ শাসনকে মেধাজীবীরা বিধাতার আশীর্বাদ রূপে বরণ করেছিলেন। কিন্তু সেই সমাজের পরিধি খুব প্রসারিত ছিল না। আসলে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে নবজাগ্রত এবং আলোকপ্রাপ্ত মননশীল ব্যক্তিরা স্বদেশের আপামর জনসমষ্টিকে তাঁদের অনুভবের জগতে টেনে আনতে পারেন নি। সমালোচক জানাচ্ছেন :

> 'যাঁরা শস্যের ভিতরে রৌদ্র আবিষ্কার করে নতুন জীবনবোধে দেশের আকাশ আলোকিত করবেন বলে প্রত্যাশা ছিল, তাঁরা, ইংরেজদের সঙ্গে একান্ত সান্নিধ্যে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির বাসনায়, জনসমষ্টি থেকে হলেন বিচ্ছিন্ন, অনন্বিত।'[১১৩]

তখনও 'য়ুরোপের চিত্তদূত' হিসেবেই ইংরেজদের গণ্য করা হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছিলেন :

> 'য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল; দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সংগত অধিকারকে। এতে করেই সকলপ্রকার অভাবত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের আত্মসম্মানের পথ খুলে গিয়েছে।'[১১৪]

কিন্তু তখনও বোঝা যায়নি যে উপনিবেশের মানুষের আত্মসম্মানের পথ এত সহজে খুলে যায় না। কলোনির নকলনবিসি শিক্ষার নিরর্থকতা তখনও তাঁদের সামনে প্রকট হয়ে ওঠেনি। খর্বিত কর্মশক্তি ও খর্বিত আত্মমর্যাদা তখনও পীড়ন করেনি বিবেককে। নব্য-শিক্ষা বলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটা কুহেলিকা তখন তাঁদের চোখে মায়াকাজল পরিয়ে রেখেছিল। সাংস্কৃতিক আধিপত্য-বাদের খেলায় 'কলোনির কলের পুতুল'রা স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছিল শাসকের শ্রেষ্ঠত্ব। এর নিষ্ফলতা বুঝতে তাদের পার হতে হয়েছিল অনেক বেদনার সমুদ্র। শতাব্দীর শেষলগ্নে বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) আত্মধিক্কারের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা-গর্বীদের অবস্থানটি ব্যক্ত করেছিলেন এই বলে যে :

> ‘আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়েছে টবে; ঠিক টবেও না, অর্কিডের মধ্যে। আমাদের পৌরুষ বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখা ব্যক্তিত্ব, আমাদের জাতি ও জীবনের কর্ম প্রবাহে, আমাদের পিতৃপুরুষদের সনাতন ঐতিহ্যে এর কোনই শিকড় নেই।...আর সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ব্যাপার এই যে তা (ইংরেজি শিক্ষা) আমাদের মন, আমাদের হৃদয়, আমাদের আত্মা, আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের পৌরুষকে আমাদের জাতীয় জীবন থেকে রেখেছে বিচ্ছিন্ন করে।’[১১৫]

আসলে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতির পারস্পরিক অন্তর্লীন সংযোগকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। উনিশের কলকাতার বুকে বিভাজিত মানচিত্রে ভদ্রলোক এবং অপরের যে সামাজিক অবস্থানটি নির্মিত হয় তার পশ্চাতে একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল ছিল নানা জটিল অঙ্ক। এর আগে গোটা অষ্টাদশ শতক জুড়ে কলকাতার বুকে রাজ করা ধনাঢ্য পরিবারগুলির সঙ্গে নিম্নবিত্ত পরিবারের বিত্তগত বৈষম্য থাকলেও তাদের শিকড় ছিল একই মাটিতে। তখন উভয়ের মধ্যে আর কোনও বড় ব্যবধান ছিল না। কিন্তু উনিশে যখন নতুন শিক্ষার জয়যাত্রা শুরু হল তখন ক্রমে ইংরেজি জানা এবং না জানার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজন দেখা দিল। এই বিভাজনের শিকড় পৌঁছে গেল এত গভীরে যে নব্য-শিক্ষার আলোক-বৃত্তের বাইরে থেকে যাওয়া মানুষগুলো হারিয়ে যেতে লাগল অপরিচয়ের আড়ালে। মেকলের চুঁইয়ে পড়া শিক্ষানীতি তেমন কোনও সুফল ফলাতে পারল না আগামীতে। একথা ভুল নয় যে ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে এসে ভারতবাসী পাশ্চাত্য সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মানবতাবাদ, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা প্রভৃতি আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং নিজ সমাজ, ধর্ম, দেশ ও জাতির দুর্বলতাগুলি অনুভব করতে পেরেছিল। ইংরেজি শিক্ষা শিক্ষিত ভারতবাসীকে এক সূত্রে আবদ্ধ করেছিল। এর ফলেই শুরু হয়েছিল নানা যুক্তিবাদী সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ার। কিন্তু এই শিক্ষার সবচেয়ে বড় ত্রুটি যে তা দেশের মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে কখনই তা গণশিক্ষায় পর্যবসিত হয়নি। আপামর জনগণের সঙ্গে শিক্ষিতের এই ব্যবধান উনিশ শতকের তথাকথিত ভদ্র ও অপরের দূরত্ব রচনার একটা প্রধান কারণ তাতে সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের কলকাতার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করেই সেই পর্বের জনসমষ্টির দ্বিধা বিভক্তিকরণটি বিচার্য।

উল্লেখপঞ্জি

১. ঘোষ, বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৬, পৃ ২

২. ওই, পৃ ৪-৫

৩. ওই, পৃ ৩

৪. শ্রীপান্থ, *কলকাতা,* আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০১৩, কলকাতা, পৃ ২১

৫. সুর, *কলকাতার নগরায়ণ রূপান্তরের রূপরেখা,* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ ১০

৬. মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন, *কলিকাতা সেকালের ও একালের,* পি এম বাকচি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, মে ২০১৩, পৃ ১০১

৭. সুর, নিখিল, *কলকাতার নগরায়ণ রূপান্তরের রূপরেখা,* পৃ ১৭

৮. ঘোষ, বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* পৃ ২০

৯. মুখোপাধ্যায়, *কলিকাতা সেকালের ও একালের,* পৃ ১০৭

১০. গুপ্ত, সমুদ্র, *শহর কলকাতার আদিপর্ব,* নতুন সাহিত্য ভবন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৬৩, পৃ ১৯

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, *কলিকাতা কল্পলতা, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২),* (সম্পা) কাঞ্চন বসু, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ ৫০৯-৫১০

১২. মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন, *কলিকাতা সেকালের ও একালের,* পৃ ১৩৫

১৩. শ্রীপান্থ, *কলকাতা,* পৃ ২১

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, *কলিকাতা কল্পলতা, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২),* পৃ ৫১০

১৫. ওই

১৬. শ্রীপান্থ, *কলকাতা,* পৃ ২৩

১৭. ঘোষ, বিনয়, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,* ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১-২

১৮. Munsi, Sunil Kumar, *dynamics of Urban Growth in Eastern India,* Kolkata (2011), Preface, তথ্যটি গৃহীত হয়েছে নিখিল সুরের *কলকাতার নগরায়ণ রূপান্তরের রূপরেখা, পৃ ৩৭* থেকে।

১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, *কলিকাতা কল্পলতা, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২),* পৃ ৫০৮

২০. *ভারতকোষ,* দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৪, পৃ ২০৮-২০৯

২১. মূল রচনাকার kipling, Rudyard, *A Tale of Two Cities,* বিনয় ঘোষের *বাংলার নবজাগৃতি* থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত।

২২. Deb, Binaya Krishna, *The Early History and Growth of Calcutta,* The Bengal Printing Company Limited, No. 7, Council House Street, 1905, p.40

২৩. সুর, নিখিল, *কলকাতার নগরায়ণ রূপান্তরের রূপরেখা,* পৃ ৩৮
২৪. ঘোষ, বিনয়, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,* পৃ ১৪
২৫. Deb, Binaya Krishna, *The Early History and Growth of Calcutta,* p.4
২৬. সুর, নিখিল, *কলকাতার নগরায়ন রূপান্তরের রূপকথা,* পৃ ৩৮
২৭. Deb, Binaya Krishna, *The Early History and Growth of Calcutta,* p.3
২৮. সুর, নিখিল, *কলকাতার নগরায়ন রূপান্তরের রূপকথা,* পৃ ২৪
২৯. মুখোপাধ্যায়, *কলকাতা সেকালের ও একালের,* পৃ ২০৪
৩০. ঘোষ, বিনয়, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,* পৃ ১৪
৩১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, *কলিকাতা কল্পলতা, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২),* পৃ ৫০৬
৩২. সুর, নিখিল, *কলকাতার নগরায়ণ রূপান্তরের রূপরেখা,* পৃ ১৩
৩৩. ওই, পৃ ১২
৩৪. ওই, পৃ ১৩
৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৬, পৃ ৪৫
৩৬. বন্দ্যোপাধায়, রঙ্গলাল, *কলিকাতা কল্পলতা, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২),* পৃ ৫১৪
৩৭. Deb, Binaya Krishna, *The Early History and Growth of Calcutta,* p.16
৩৮. সুর, নিখিল, *কলকাতার নগরায়ণ রূপান্তরের রূপরেখা,* পৃ ২২-২৩
৩৯. শ্রীপান্থ, *কলকাতা,* পৃ ২৯
৪০. রায়, নিশীথরঞ্জন, *কলকাতা : ইতিহাসের উপাদান,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ ২৭-২৮
৪১. ওই, পৃ ২৮-২৯
৪২. ওই, ২৯
৪৩. গুপ্ত, সমুদ্র, *শহর কলকাতার ইতিবৃত্ত,* পৃ ৫১
৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, *কলিকাতা কল্পলতা, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২),* পৃ ৫১৪
৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ ৩৯
৪৬. সুর, নিখিল, *কলকাতার নগরায়ণ রূপান্তরের রূপরেখা,* পৃ ১০
৪৭. ঘোষ, বিনয়, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,* পৃ ১৪
৪৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* পৃ ৩৯
৪৯. মল্লিক, রায়বাহাদুর প্রমথনাথ, *কলিকাতার কথা (আদিকান্ড),* (সম্পা) ড. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০১, পৃ ৮৫
৫০. ঘোষ, বিনয়, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,* পৃ ১৫
৫১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, *কলিকাতা কমলালয়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সংগ্রহ,* (সম্পা) রমেন কুমার সর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ ৩২

৫২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ২০১৫-১৬, পৃ ১৬

৫৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, *নববাবু বিলাস, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সংগ্রহ,* পৃ ১৭২

৫৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, *কলিকাতা কল্পলতা, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২),* পৃ ৫০৫

৫৫. ঘোষ, বিনয়, *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত,* বাক্ সাহিত্য, ১৯৮৩, কলকাতা, পৃ ২৪১

৫৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, *কলিকাতা কল্পলতা,* দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২), পৃ ৫১৭

৫৭. মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন, *কলকাতা সেকালের ও একালের,* পৃ ৩৩৯

৫৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* পৃ ৭১

৫৯. রায়, নিশীথরঞ্জন, *কলকাতা ইতিহাসের উপাদান,* পৃ ৩২

৬০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* পৃ ৭২

৬১. গুপ্ত, সমুদ্র, *শহর কলকাতার আদিপর্ব,* পৃ ৮৭

৬২. গুহ, রণজিৎ, *দয়া : রামমোহন ও আমাদের আধুনিকতা,* তালপাতা, ২০১১, পৃ ৯৩-৯৪

৬৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* পৃ ১৯

৬৪. ঘোষ, বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* পৃ ৩৩

৬৫. মল্লিক, রায়বাহাদুর প্রমথনাথ, *কলিকাতার কথা (আদিকান্ড),* পৃ ১৯৭

৬৬. ঘোষ, বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* পৃ ২১-২২

৬৭. ঘোষ, বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* পৃ ২২

৬৮. ঘোষ, বিনয়, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,* পৃ ৩

৬৯. ওই, পৃ ৩

৭০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* পৃ ১৬

৭১. ঘোষ, বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* পৃ ৪৪

৭২. ঘোষ, বিনয়, ওই, পৃ ৫

৭৩. ঘোষ, বিনয়, ওই, পৃ ৪৫

৭৪. ঘোষ, বিনয়, ওই, পৃ ১৪৬

৭৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য,* কারিগর, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ ৫৫

৭৬. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *বঙ্গদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ, বঙ্কিম রচনাবলী (২),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ ৭৭৬-৭৭৭

৭৭. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা,* (সম্পা) অরুণ নাগ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৪০৩, পৃ ৪৪

৭৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *উপেক্ষিতা পল্লী,* শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবের অভিভাষণ, চৈত্র ১৩৪০, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত *রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড,* বিশ্বভারতী, মাঘ ১৮২১, পৃ ৩৭১

৭৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ছেলেবেলা,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, প্রথম এনবিটি সংস্করণ ২০১০, পৃ ৩৮

৮০. সুর, নিখিল, *কলকাতার নগরায়ণ : রূপান্তরের রূপরেখা,* পৃ ৬৫
৮১. রায়, নিশীথরঞ্জন, *কলকাতা ইতিহাসের উপাদান,* পৃ ৪৪-৪৫
৮২. ওই, পৃ ৪৮
৮৩. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* (সম্পা) বারিদবরণ ঘোষ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, কলকাতা, পৃ ৩৬
৮৪. গুপ্ত, সমুদ্র, *শহর কলকাতার ইতিবৃত্ত,* পৃ ২০৭
৮৫. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা,* (সম্পা) অরুণ নাগ, পৃ ১১৬
৮৬. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* পৃ ৩৬
৮৭. ওই, পৃ ৩৭
৮৮. সুর, নিখিল, *কলকাতার নগরায়ণ : রূপান্তরের রূপরেখা,* পৃ ৫৪
৮৯. ঘোষ, বিনয়, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,* পৃ ৬
৯০. ওই, পৃ ২
৯১. ঘোষ, বিনয়, *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত,* বাক্ সাহিত্য, ১৯৮৩, কলকাতা, পৃ ২৫০
৯২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* পৃ ৯২
৯৩. সুর, নিখিল, *মুখবন্ধ, কলকাতার নগরায়ণ রূপান্তরের রূপরেখা,* পৃ ৩
৯৪. ঘোষ, বিনয়, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,* পৃ ৬
৯৫. সুর, নিখিল, *কলকাতার নগরায়ণ রূপান্তরের রূপরেখা,* পৃ ৮৩
৯৬. ওই, পৃ ৮৬
৯৭. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* পৃ ৪৯
৯৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য,* কারিগর, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ ১০০
৯৯. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* পৃ ৫৬
১০০. পোদ্দার, অরবিন্দ, *শস্যের ভিতরে রৌদ্র : অন্বিষ্টের সন্ধানে সমাজমানস, উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৩, পৃ ২২
১০১. রায়, অলোক, মুখবন্ধ, *উনিশ শতক,* প্রমা, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ ১১
১০২. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* পৃ ৪৯
১০৩. বসু, রাজনারায়ণ, *সে কাল আর এ কাল, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (৩),* (সম্পা) কাঞ্চন বসু, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা,সপ্তম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ ১২৪
১০৪. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* পৃ ৩০
১০৫. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ৬২
১০৬. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* পৃ ৬৩
১০৭. গুপ্ত, সুশীল কুমার, *ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ,* এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৮৩, পৃ ১৭৭
১০৮. পত্রী, পূর্ণেন্দু, *বঙ্কিম যুগ, প্রথম খণ্ড (১৮৩৮-১৮৫৮),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ ২১৬

১০৯. টমাস ব্যাবিংটন মেকলের *মিনিট অন এডুকেশন,* কলকাতা, ১৮৩৫। তথ্যটি গৃহীত হয়েছে শ্রীপান্থের কলকাতা গ্রন্থের *কালেজ-বয়* নামক প্রবন্ধ থেকে, পৃ ৩২২

১১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য,* কারিগর, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ ১২৯

১১১. ঘোষ, বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* পৃ ১৫২

১১২. পোদ্দার, অরবিন্দ, *শস্যের ভিতরে রৌদ্র : অন্বিষ্টের সন্ধানে সমাজমানস,* পৃ ২০

১১৩. পোদ্দার, অরবিন্দ, *শস্যের ভিতরে রৌদ্র : অন্বিষ্টের সন্ধানে সমাজমানস,* পৃ ৩২

১১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কালান্তর,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪১৭, পৃ ১৯

১১৫. পোদ্দার, অরবিন্দ, *শস্যের ভিতরে রৌদ্র : অন্বিষ্টের সন্ধানে সমাজমানস,* পৃ ৩৩